শুকতারা
দশম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
চৈত্র ১৩৬৩
দেব সাহিত্য ক

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপিঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"শুকতারা" পড়ছো যে সব ভাইবোনেরা—

কাগজ

যে কত দামী তা' তোমরা জানো। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভোজ এই কাগজের পাতায় ক'রে পরিবেশন ক'রেছেন বিশ্বের জ্ঞানী গুণীরা তোমাদের কাছে। এই কাগজের সম্মান তোমরাই রাখবে—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা, অর্থাৎ লেখাপড়ায়।

●

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, লেখন সামগ্রী
ইত্যাদি বিক্রেতা

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"—৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

●

—শাখা—

কলিকাতার সর্ব্বত্র, উত্তর প্রদেশ ও আসাম

ফোন—ব্যাঙ্ক ৪৯৯১ পোঃ বক্স—১৬২ তার—"নোটপেপার"

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).
(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950).

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৬৩

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	অরণ্যে এমনিই হয় (চিত্র-পরিচয়)	কুমারী তপতীরাণী	মুখপত্র
২।	মহাভারতের গাহ স্তয় (কবিতা)	শ্রীঅরুণকুমার মৈত্র (সাহিত্যশ্রী)	৮৭
৩।	রেড-ক্রশ সোসাইটি (প্রবন্ধ)	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৮৮
৪।	নিষ্ঠা ও স্নেহ (গল্প)	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৯২
৫।	এই বুড়ো পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)	অনুপমা দেবী	৯৫
৬।	আজব সহর কোলকাতা (কবিতা)	ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ	১০১
৭।	বালকের শক্তি-সাধনা (গল্প)	শ্রীকাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	১০২
৮।	রাজা ও কবি (গল্প)	প্রবীরকুমার	১০৬
৯।	মণিমুক্তা	স্যার আর্থার কন্যান ডয়েল	১১১
১০।	নতুন দৃষ্টি (গল্প)	কুমারী পুষ্পা চট্টোপাধ্যায়	১১২
১১।	গল্প বলো (গল্প)	শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ	১১৪
১২।	খোকা-খুকু ঘুমালো (কবিতা)	শ্রীদীপক কুমার দত্ত	১১৯
১৩।	সোনালী পাখী (রূপকথা)	মুরারিমোহন বিট্	১২১
১৪।	একটুখানি হাসো (হাস্যকৌতুক)	শ্রীকল্যাণ সেনগুপ্ত	১৩২
১৫।	ইস্কাবনের টেক্কা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	১৩৩
১৬।	শুকতারার কবি চলে গেছে শুকতারার দেশে		১৪১
১৭।	সাবাস এ, সি, সরকার (কবিতা)	সুনির্ম্মল বসু	১৪২
১৮।	সোনার ভারত (চিত্রে ইতিহাস)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	১৪৩
১৯।	শহীদ (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	অসীমকুমার রায়	১৪৬
২০।	ঠাকুরের দুগ্ধপান (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	শ্রীদিলীপকুমার শীল	১৫২
২১।	পিতৃস্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)		১৫৩
২২।	খেলার আসর (খেলাধূলা)	শ্রীসাংবাদিক	১৫৪
২৩।	রাইট্ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের জীবন-চিত্র (চিত্রে জীবনী)		১৫৮
২৪।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)		১৬১
২৫।	দাদুমণির চিঠি		১৬৫

পাদপূরণ

অবাক হয়ে শোনো ৮৮
জান কি ? ১০০

পাদপূরণ

জেনে রাখা ভালো ১১৩, ১২০, ১৪০, ১৫৭, ১৬০

জরুরী ঘোষণা

'শুকতারা'র পাঠক-পাঠিকাগণ !

ফাল্গুন মাসে "শুকতারা" দশম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

যাঁরা

দশম বর্ষেও গ্রাহক বা গ্রাহিকা হ'য়ে নিয়মিতভাবে 'শুকতারা' পেতে চান,

তাঁরা

এমাসেই মণি-অর্ডার ক'রে চার টাকা পাঠাবেন।

আর

কেউ যদি ভিঃ পিঃ-তে পেতে চান, তাও পত্র দ্বারা জানিয়ে দেবেন।

কিন্তু

মনে রাখবেন, ভিঃ পিঃ-তে নিলে ছ' আনা খরচ বেশী পড়বে।

"শুকতারা"র নিয়মাবলী

১। "শুকতারা"র চাঁদার হার (সডাক): বার্ষিক—৪৲, ষাণ্মাসিক—২৷৷০ ও প্রতি সংখ্যা ।৵০। নমুনা-সংখ্যার জন্য ।৴০ আনার ডাক-টিকেট বা মণি-অর্ডার যোগে ।৴০ আনা পাঠাইতে হয়।

২। ফাল্গুন মাস হইতে "শুকতারা"র বর্ষ আরম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া, ফাল্গুন অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

৩। প্রতি মাসে ১লা তারিখের মধ্যেই পত্রিকা Ordinary Post-এ পাঠান হয়। ৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা পত্রিকা না পাইবার বিষয়ে সুপারিশ করাইয়া চিঠি লিখিলে, Certificate of Postingএ পুনরায় পাঠান হয়।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৫। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের গল্প, কবিতা, ফটো অথবা তাঁহাদের আঁকা ছবিও "শুকতারা"য় প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান কিংবা অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব হয় না। বিভিন্ন বিভাগের লেখা আলাদাভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া ও নকল রাখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৬। ধাঁধার উত্তর ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের অফিসে পৌঁছান দরকার।

"শুকতারা"-বিভাগ
২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

সম্পাদক,
"শুকতারা"

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, ভারতীয় কর্ত্তৃক ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং ২৪ নং ঝামাপুকুর লেন, দেব প্রেস হইতে মুদ্রিত। শ্রীমধুসূদন মজুমদার, ভারতীয় কর্ত্তৃক ২১।১, ঝামাপুকুর লেন হইতে সম্পাদিত। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ, ২১ নং ঝামাপুকুর লেন কর্ত্তৃক উক্ত পত্রিকা অধিকৃত। এই সকল ঘটনা সুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সত্য বলিয়া স্বীকৃত।

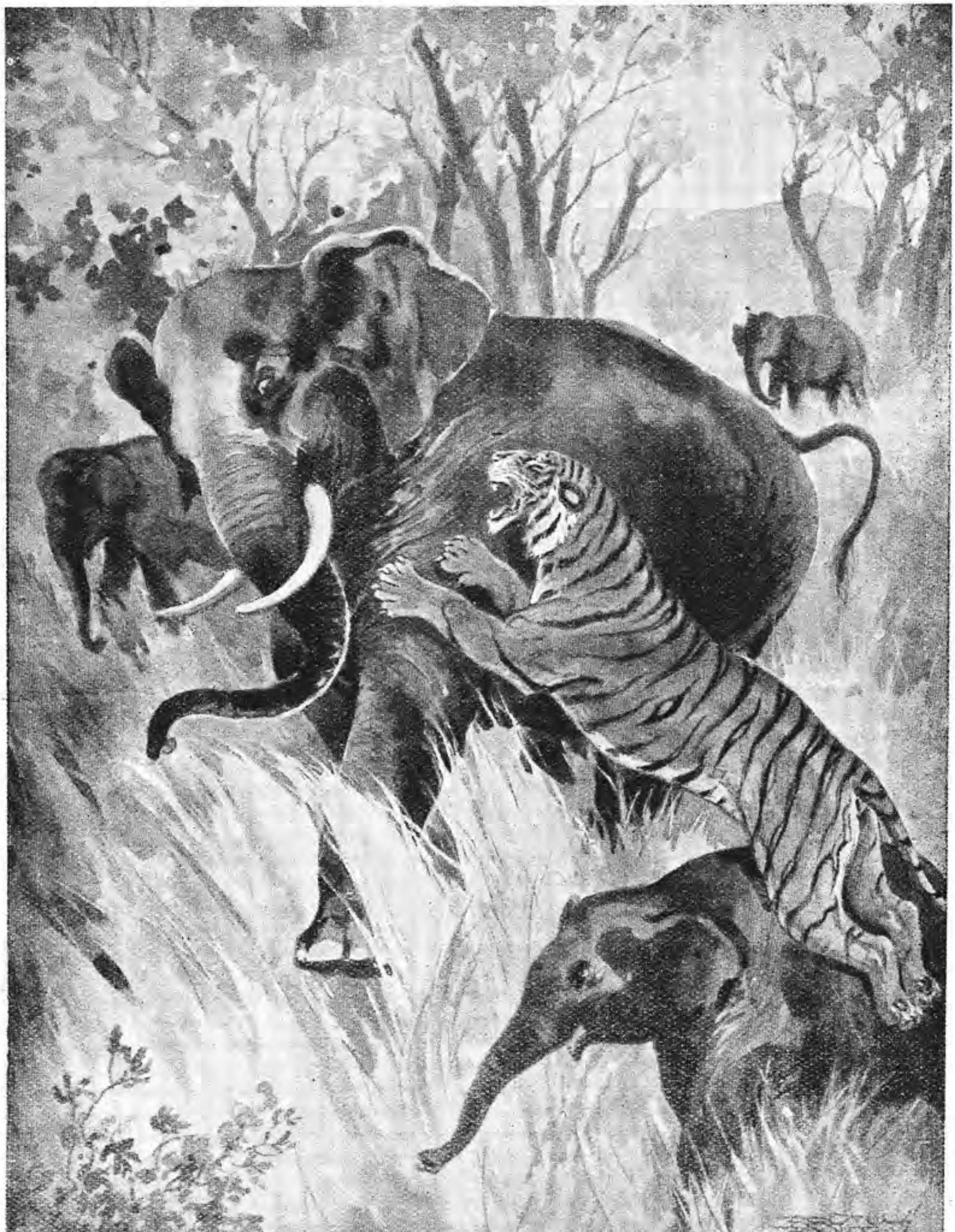

অরণ্যে এমনিই হয়

অরণ্যে এমনিই হয়

—কুমারী তপতীরাণী

বিশাল দুর্ভেদ্য অরণ্য, সেই অরণ্যের ভেতর একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোকা আর পাখী, সাপ আর নেউল, বাঘ আর হাতী। পাখীরা মাটিতে নেমে খুঁজছে পোকা, তাদের খাদ্য···পাখীকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাপ···সাপের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে নেউল··· প্রত্যেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষিদের তাড়নায় এবং যে-বলবান তার সামনে যখনি পড়ছে দুর্ব্বল কোন জন্তু, বলবান তাকে গ্রাস করে ফেলছে। একটু অসতর্ক হয়েছ কি অমনি বলবানের ক্ষুধিত আক্রমণের সামনে নিঃশেষিত হয়ে যেতে হবে। এই অবাধ হত্যার রাজ্যে তাই প্রত্যেক প্রাণী, তা সে যত ছোটই হোক্, আত্মরক্ষার জন্যে নানা-রকমের অস্ত্র নিজের ভেতর থেকে উদ্ভাবন করেছে। হরিণের শিং তার শোভা নয়, তার আত্মরক্ষার অস্ত্র, সজারুর গায়ের কাঁটা তাই শত্রু দেখলেই আপনা থেকে বর্শার মতন জেগে ওঠে, অমন যে ছোট পিঁপড়ে, তার কামড়ে যে বিষ থাকে, তা তার আত্মরক্ষার জন্যেই, আমরা আইভরী পাবো বলে নয়, অরণ্য-ত্রাস বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই হাতীরা অরণ্যে দল বেঁধে থাকে এবং ক্ষুধার্ত্ত বাঘ সে-দলের মধ্যে পড়লে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। দলবদ্ধ থাকে বলে পিঁপড়ের ভয়ে বাঘ-ভাল্লুককেও পালাতে হয়।

অরণ্যের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছে এই দলবদ্ধতার শিক্ষা।

আক্রমণকারী যতই বলশালী হোক্, দলবদ্ধ দুর্ব্বলকেও তাকে সমীহ করে চলতে হয়।

এই নীতি আমরা ভুলে যাই, সেইটেই ভারতের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডী

শুকতারা

দশম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১৩৬৩, চৈত্র

মহাভারতের গাহ জয়

—শ্রীঅরুণকুমার মৈত্র, সাহিত্যশ্রী

চীন থেকে এল চো-এন্-লাই,
রুশ হ'তে এল বুলগানিন।
সিকিম, ভুটান কেহ বাদ নাই,
মহাভারতের সাড়া নবীন।
ইথিওপিয়ার সম্রাট এল,
তিব্বত থেকে লামাদ্বয়।
নেপালের থেকে "আচার্য্য" এল
মহাভারতের কোথায় ক্ষয় ?
বুদ্ধ-যীশুর পদ-রজ-পূত, এ'মহাভারত জেগেছে আজ,
জন্ম যেথায় "শঙ্কর" লভে, সৃষ্টি যেথায় অমর তাজ।

হিন্দু সেথায় মুসলিম আর খ্রীষ্টান সহ করিছে বাস,
সে ভারত কভু মরিবে না জেন, কে করিতে পারে তারে বিনাশ।
আমরা সবাই ভারতীয় জানি; মহাভারতের সুসন্তান,
শান্তি-সেনানী মহাভারতের কণ্ঠে মোদের সাম্যগান।
বাঁচিবে ভারত, বাঁচিব আমরা, এই যেন আজ কাম্য হয়,
নতুন যুগের নওজোয়ানেরা গাহ ভারতের গাহ হে জয়।

● **অবাক হয়ে শোন**

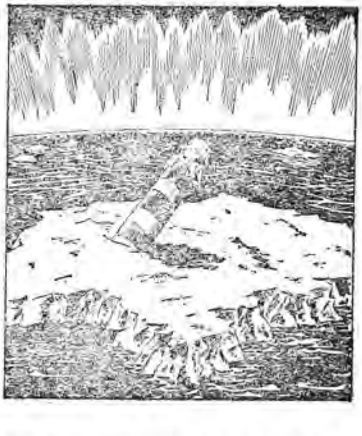

১নং চিত্র। ভালবেসে মানুষকে বশে আনা খুব সোজা। কিন্তু জোর করে তাকে বশে রাখতে হলে জড়শক্তির প্রয়োজন হয়। তাতে ক্ষণিক কাজ হলেও পরিণামে সেটা স্থায়ী হয় না।

২নং চিত্র। সাদা জলের মাছ জল পান করে না। কারণ, এর মুখে জল ঢুকে কানকো দিয়ে বেরিয়ে যায়। সমুদ্রের মাছ লবণ জল শোষণ ক'রে নিজ শরীরের মধ্যে জল থেকে লবণ আলাদা করে বিশুদ্ধ জল পান করে।

৩নং চিত্র। উত্তর-মেরুকে কোন স্থূল চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা যায় না। কারণ বরফ গলে চিহ্ন সব [illegible] যায়।

রেড-ক্রশ সোসাইটি

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

তোমরা এখন পথে যে হাসপাতালের গাড়ী দেখ—সে-গাড়ীতে করে হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়া হয়—এ গাড়ীর গায়ে দেখেছো লাল রঙের ক্রশ-চিহ্ন—এর মানে রেড-ক্রশ। এই রেড-ক্রশ মার্কা হলো রেড-ক্রশ সোসাইটির চিহ্ন।

এই রেড-ক্রশ সোসাইটির সৃষ্টি হলো কি করে এবং এ সোসাইটি কি-সব মহৎ কাজ করেছেন, জানা দরকার।

একশো বছর আগেকার কথা। য়ুরোপে তখন দু-দুটি মহাযুদ্ধ চলেছে—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ইতালীর যুদ্ধ। দুটি যুদ্ধেই অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে—সব পক্ষেই অসংখ্য লোক যুদ্ধে আহত হয়ে সেবার অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থেকে প্রাণ দিচ্ছে। আহত লোকদের এভাবে সেবার অভাবে মৃত্যু—এতে মন টললো একটি ইংরেজের মেয়ের। এ মেয়েটির নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল—কুমারী মেয়ে! তিনি সব বিপদ উপেক্ষা করে, সকলের নিষেধ ঠেলে ছুটলেন ক্রিমিয়ার রণ-ক্ষেত্রে—কয়েকজন সঙ্গিনী হলেন তাঁর সহচারিণী। সেখানে গিয়ে তিনি শত্রু-

মিত্র কোনো পক্ষের বাছবিচার না করে আহত সেনাদের সেবা-শুশ্রূষায় দেহমন উৎসর্গ করলেন। তাঁদের সেবাযত্নে অনেক আহত সেনা সেরে প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠলো। যত দেশের কাগজে কাগজে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের এ পুণ্যকাজের জন্য জয়ধ্বনি উঠলো।

এ জয়ধ্বনি শুনলেন সুইজার্লাণ্ডের খুব এক ধনী ব্যাঙ্কার। এঁর নাম আঁরি ডুনা। এ খবর পেয়ে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ইতালীর সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার যেখানে যুদ্ধ—সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছুটলেন। তিনি গিয়ে যুদ্ধে হিংসার যে মূর্ত্তি দেখলেন—তা দেখে জেনেভায় ফিরে তারি বর্ণনা বিবৃত করে একখানি বই লিখলেন। সে বই ছাপিয়ে তার এক এক কপি তিনি পাঠালেন যত রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে—তারপর নিজে গিয়ে দেখা করলেন য়ুরোপের যত রাজ্যের সেনাপতি, মন্ত্রী এবং ডাক্তারদের সঙ্গে। শাসন-পরিষদ, বিচার-বিভাগ সর্ব্বত্র তিনি আন্দোলন তুললেন—যুদ্ধ করতে চাও করো—তা বলে যুদ্ধে যে সব সেনা আহত হয়ে পড়ে থাকে, তাদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করবে না? আহত মানুষের সঙ্গে কারো শত্রুতা থাকতে পারে না। সেবা-শুশ্রূষায় তারা বাঁচতে পারে—তাদের কেন বাঁচাবে না? তাদের বাঁচানো মানুষ-মাত্রেরই কর্ত্তব্য!

১৮৬২ সালে ডুনার বই ছেপে বেরোয়—১৮৬৪ সালে জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক সভায় সকল রাজ্যের প্রতিনিধিরা মিলে সাব্যস্ত করেন—যুদ্ধে আহতদের সেবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সত্যই তো, দেশের জন্য এরা ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে যুদ্ধে এসেছে। যুদ্ধে আহত হলে তাদের কেউ দেখবে না! কিন্তু এত বড় ব্যাপারে অনেক টাকা চাই।

ডুনা বললেন—আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি এ কাজে দেবো। তখন সকলের সমবেত চেষ্টায় বিভিন্ন জাতীয় রেড-ক্রশ সোসাইটির সৃষ্টি হলো। এবং সমবেত সেবার ফল দেখে সব জাতি মিলে এক হয়ে সোসাইটির বিধি-নিয়ম তৈরী করলেন। স্থির হলো—যত শত্রুতাই থাকুক, যুদ্ধক্ষেত্রে সেবার কাজে যে সব অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী বা হাসপাতাল থাকবে, সেগুলির উপর কোনো পক্ষ আক্রমণ চালাবে না—সেগুলিকে সমানে নিরাপদে রাখবে—তাদের এবং এসব সংশ্লিষ্ট লোকজনের যাওয়া আসা এবং অবস্থানাদির সম্বন্ধেও নিরাপদ ব্যবস্থা থাকবে।

সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত রেড-ক্রশ সোসাইটির কাজ অব্যাহতভাবে চলে আসছে। সোসাইটির কাজের প্রসার বেড়েছে—সদস্য-সংখ্যাও বেশ বেড়ে চলেছে। রেড-ক্রশের উপর কোনো পক্ষের আজ পর্য্যন্ত হিংসা-বিদ্বেষ বা আক্রোশ দেখা যায় না।

আহতদের রণক্ষেত্র থেকে হাসপাতালে বা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের সারিয়ে তোলার কাজেই এখন আর সোসাইটির কাজ সীমাবদ্ধ নেই—যুদ্ধে যাঁরা মারা যান, তাঁদের অনাথ পরিবার-প্রতিপালনের ভার এখন সোসাইটি গ্রহণ করেন—শত্রুর কারাগারে যাঁরা বন্দী থাকেন, সেইসব বন্দীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বন্দীদের

খবরাখবর দেয়া-নেয়ার ভারও এখন এই সোসাইটি গ্রহণ করেছেন। সোসাইটির একাজে কোনো জাত, কোনো পক্ষ বাধা দিতে পারে না—তাদের সে অধিকার নেই।

রেড-ক্রশ সোসাইটিতে নানা বিভাগ আছে এবং সেই সব বিভাগ জড়িয়ে রেড-ক্রশে এখন কাজ করছেন প্রায় পাঁচ-ছ হাজার লোক—মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে। এসব বিভাগে ফাইল আছে লক্ষ লক্ষ। সে সব ফাইলে আহত এবং বন্দীদেরও সেই সঙ্গে তাঁদের স্ত্রী-পুত্রকন্যা মা-বাবা ভাইবোন—সকলের নামধাম লেখা থাকে। কারো সংবাদ চাইলে সে সংবাদ যথাসম্ভব শীঘ্র তা জানানো হয়।

কোনো ক্যাম্পে শত্রুপক্ষীয় কোনো বন্দীকে আনা মাত্র তাঁর নাম ধাম কোথায় কে আত্মীয়-স্বজন আছেন জিজ্ঞাসা ক'রে সে-সব লিখে নেওয়া হয়, এবং এ পরিচয়ের এক এক কপি পাঠানো হয় সঙ্গে সঙ্গে জেনেভায় সোসাইটির হেড-অফিসে। বন্দীদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে সে খবর তাঁদের আত্মীয়-বন্ধুকে তখনি জানানো হয়। জেনেভার অফিসে নামের পাতায় বর্ণমালা-ক্রমে জাতি-নাম-ধাম সমেত এঁদের পরিচয় লেখা থাকে। সর্ব্বত্রই সোসাইটির বহু এজেন্ট আছেন—তাঁদের কাজ যুদ্ধে আহত, নিহত বা নিরুদ্দিষ্টদের সন্ধান নেওয়া।

সোসাইটির অফিসে কত করুণ কাহিনী শোনা যায়। এক পোলিশ রমণী তাঁর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খবর কোথাও না পেয়ে জেনেভার অফিসে এসেছিলেন—খবর চাইবামাত্র তিনি খবর পেলেন এবং তার ফলে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে তিনি ফিরে পেয়েছিলেন।

জেনেভার হেড-অফিসে আলাদা একটি ডাকঘর আছে—Prisoners' Post Office। যাঁরা শত্রুপক্ষের কারাগারে বন্দী, তাঁদের আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে খবর দেয়া নেয়ার কাজ চলে এই ডাকঘর-মারফৎ। এসব চিঠি মারা যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

যুদ্ধের হিংসা-দানবের তাণ্ডবের আড়ালে এই যে করুণা-মমতার নির্ঝর-ধারা—এ নির্ঝর-ধারার সৃষ্টির মূলে—কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং আঁরি ডুনার জীবনাদর্শ।

নিষ্ঠা ও স্নেহ

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

স্নেহ বা ভালবাসায় মানুষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে অনেক সময় ; জেনেশুনেও অন্যায় করে বা মিছে কথা বলে। কিন্তু যে দুর্ব্বল হয় না—তার কি স্নেহ কম ? ভালবাসলে কি আর আদর্শ বা সত্যনিষ্ঠা বজায় রাখা যায় না ?

এ প্রশ্নের জবাব যুগে যুগে মানুষ দিয়েছে—অনেক রকম ভাবে।

আজ এমনি একটি জবাবের কথাই বলছি।

স্কটল্যাণ্ডের এক সুদূর পার্ব্বত্য এলাকায় কির্কপ্যাট্রিক-আয়রণ-গ্রে গ্রাম। সেখানকার এক কৃষক পরিবারে হেলেন ওয়াকার বলে একটি মেয়ে জন্মেছিল—দু'শ বছরেরও অনেক আগে।

ভগবান ওকে যেন যুদ্ধ করবার জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন ! হেলেন নিজেই যখন এতটুকু মেয়ে, ওর বাবা মারা গেলেন। মা, ছোট একটি বোন এবং নিজে—এই তিনটি প্রাণীর ভার এসে পড়ল ওর ওপর। ভার ওর নেবার কথা নয়। কারণ, মা-ই ত বেঁচে ছিলেন ! কিন্তু হেলেন নিজেই স্বেচ্ছায় যেন সে ভার তুলে নিল। অথচ সে বয়সে তখনকার দিনের মেয়েরাও অনেকেই পুতুল খেল্‌ত।

অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে—পুরুষ মানুষের মত ক্ষেতের কাজ, বাগানের কাজ এবং গোরু-বাছুরের কাজ এক হাতে চালাতে লাগলো হেলেন। শুধুই খাওয়া-পরা নয়, নিজের লেখাপড়ার সাধ মেটেনি ; তাই বোনের লেখাপড়ার কোন ক্ষতি না হয় সেদিকেও কড়া নজর রাখল সে। তখনকার দিনে মেয়েদের যতটা লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ছিল, ততটাই শেখাল বোনকে।

বোনটি মানুষ হয়ে উঠল, এইবার ওদের দুজনেরই বিয়ে-থা দেবার জন্যে মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এমন সময় সামান্য অসুখে ওদের মা মারা গেলেন।

আর সে-ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে ছোট বোন এফী পুলিশের হাতে ধরা পড়ল—খুনের দায়ে।

এফী তখনও নাবালিকা, কিন্তু খুন সে করেছিল ঠিকই, আর হেলেনও তা জানত। ভয়ে দিশাহারা হয়ে খুন করেছে ; তবুও খুন ত !

যথাসময়ে আদালতে মকদ্দমা উঠ্‌ল।

দেখা গেল যে হেলেনই সর্ব্বপ্রধান সাক্ষী। হেলেন যদি সামান্য একটি মিছে-কথা বলে ত এফী বেঁচে যায়। এফীর উকীল অনুনয় করলেন, সকলেই আশা করল যে, হেলেন বোনের জন্যে নিশ্চয়ই এই মিছে কথাটুকু বলবে। ছোট্ট বোনটি ওর প্রাণ —বোধহয় প্রাণের চেয়েও ভালবাসে বোনকে—তার জন্য সামান্য মিছে কথা বলবে না ?

'দেখেছ তুমি ?'

'না, আমি দেখিনি।'···এই ত, এইটুকু মাত্র।

কিন্তু হেলেন চোখ বড় বড় ক'রে বললে, 'ওমা, সে কি ? জেনে শুনে মিছে কথা বলব কি ক'রে ?'

'এইটুকু না বললে এফীর নিশ্চয় মৃত্যু !'

'এফীকে আমি ভালবাসি, হয়ত প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। কিন্তু সত্য যে শুনেছি প্রাণের চেয়েও বড়। প্রাণ ত একদিন যাবেই, সত্য অক্ষয়। যীশু আমাদের সকলকেই কি মিছে কথা বলতে নিষেধ করেন নি ?'

সকলে মিলে বোঝালো ওকে। গ্রামের বুড়ো-বুড়ীরাও অনেকে এলেন বোঝাতে। এমন নির্ব্বুদ্ধিতা যেন ও না করে। ছেলেমানুষ না বুঝে একটা কাজ ক'রে ফেলেছে—তাকে বাঁচানোই দরকার। একটু মিছে কথা বললে যদি একটা প্রাণ রক্ষা হয়, সেটা ওর দেখা দরকার বৈকি। না হয় একটু অতিরিক্ত প্রার্থনা ক'রে ঈশ্বরের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করলেই হবে !

কিন্তু হেলেন অটল, ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হয়। ধর্ম্মাধিকরণ সেটা—সেখানে মিছে কথা বলতে সে পারবে না। এফীর জন্যও না।

সত্য কথাই সে বললে, এবং বিচারে এফীর ফাঁসির হুকুম হ'ল।

আদালত থেকে ফিরে কিন্তু হেলেন আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করলে না। তখনই, সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে প্রায় একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল রাজধানী লণ্ডনের দিকে। গাড়ীতে যাবার পয়সা নেই, আগাগোড়া হাঁটাপথে যাওয়া। তখনকার দিনে পথঘাট বড় বিপজ্জনক ছিল, গাড়ীতে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না আদৌ। চুরি ডাকাতি রাহাজানি —এ ত নিত্যকারের ঘটনা। বিশেষ ক'রে হেলেনের মত অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে একা এত পথ হেঁটে যাওয়ার কথা ত লোকে কল্পনাই করতে পারত না। হেলেন বিশেষ কাউকে নিজের মতলব খুলে বলেনি। কিন্তু যা দু' একজনকে জানিয়েছিল, তাঁরা সকলেও ওকে নিষেধ করেছিলেন এমন পাগলামী করতে।

হেলেন কিন্তু কারুর কোন কথাই শুনলে না। দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা, কিছুদূর যাবার পরই জুতো ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সম্বল সামান্যই—জুতো কিনতে গেলে আর পেটে খাওয়া যায় না। সে খালি পায়েই চলল। একুশ দিনে চারশ' মাইল পথ, ঐ ঠাণ্ডার দেশে—অসম্ভব মনের জোর না থাকলে কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ হেলেনের মত মেয়ের পক্ষে ত নয়ই।

তবু হেলেন সেই অসাধ্য-সাধনই করলে।

লণ্ডনে পৌঁছে সেই অবস্থায় সে হাজির হ'ল স্কট্ রাজপুরুষ ডিউক অফ আরগাইলের প্রাসাদে। সেখানে দারোয়ানদের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে শেষ পর্য্যন্ত একসময় হাজির হ'ল তাঁর সামনে।

ওর ঐ ধূলিধূসরিত ক্লান্ত দেহ, ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত পা আর দেশী সাদাসিধে পোষাক—ম্লানমুখ এবং অশ্রুছলো-ছলো চোখে কী ছিল, ডিউক অব আরগাইল স্থির হয়ে বসে ওর সমস্ত কথাই শুনলেন এবং তখনই সেই অবস্থায় ওকে নিয়ে গেলেন রাণী কেরোলাইনের কাছে। রাণীও ওর ঐ অবস্থা দেখে, কীভাবে এসেছে তার পূর্ণ বিবরণ শুনে এবং সত্য ও স্নেহের দ্বন্দ্বে কী ভাবে ও মনের সঙ্গে লড়াই ক'রে সত্যে অবিচলিত থেকেছে সেটা অনুভব ক'রে—তখনই তিনি ওর দরখাস্তে সই ক'রে দিলেন।

এফীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মঞ্জুর হ'ল—শুধু তাই নয়, একেবারেই ছাড়া পেয়ে গেল সে।

রাণীর হুকুমনামা নিয়ে তখনই আবার রওনা হ'ল হেলেন। আবার সেই দীর্ঘ পথ। পা যেন আর চলে না, বড় বড় ঘা হয়ে গেছে অনবরত খালি পায়ে পথ হেঁটে। আহার নেই বিশ্রাম নেই, তবু চলেছে হেলেন। তাকে যে পৌঁছতেই হবে। অবশেষে যখন আর ফাঁসির মাত্র দুটি দিন বাকী আছে তখন কোনমতে সে এসে ওদের জেলার সদরে পৌঁছল।

যাক্—বাঁচাতে পেরেছে সে। এফীকে সে বাঁচিয়েছে। সে-ই বোনকে ঠেলে দিয়েছিল ফাঁসির মুখে, আবার সে-ই ফিরিয়ে আনল। সত্য ও স্নেহের দ্বন্দ্বে কাউকেই সে হার মানতে দেয়নি—দুদিকই বজায় রাখতে পেরেছে সে; এই তার তৃপ্তি, এই তার পুরস্কার।

দীর্ঘকাল বেঁচেছিল হেলেন ওয়াকার। প্রায় একশ বছর বয়সে—১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মারা যায় সে। নিজে সে বিয়ে করেনি, কিন্তু যতদিন দেহে এতটুকু শক্তি ছিল, ততদিনই প্রাণপণে খেটে গেছে। দেশের, বিশেষতঃ নিজের গ্রামের লোকের বিপদে আপদে সে-ই ছিল ভরসা। সে নিজেও গরীব, তবু যতটা সম্ভব, চিরকালই গরীবের উপকার করত। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়াও শিখেছিল খানিকটা। এক-কথায়, যে কোন দেশের গর্ব্ব করবার মতই, মহীয়সী মহিলার জীবন-যাপন করে গেছে সে।

ইংরেজী ভাষায় বিখ্যাত লেখক সার ওয়াল্টার স্কট্ হেলেনের কাহিনী শুনেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "হার্ট অফ মিডলোথিয়ান" বইতে জিনি ডিনস্ বলে একটি চরিত্র আছে। হেলেন ওয়াকারের জীবন থেকেই সে ছবিটি তিনি এঁকেছেন। হেলেন মরবার পর স্কট্ই নিজের টাকা দিয়ে তাঁর সমাধিটি ভাল ক'রে বাঁধিয়ে দেন এবং তার ওপর সাদা পাথরে হেলেনের কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করান। সে কাহিনীর ভাষাও তাঁরই।

এই বুড়ো পৃথিবী

—অনুপমা দেবী

ভগবান বিষ্ণুর দশটি অবতার। তার ভিতর দ্বিতীয় অবতার হলেন কূর্ম। জগৎজোড়া এক কচ্ছপ। তারই পিঠে চার কোণে দাঁড়িয়ে আছে চার ঐরাবত হস্তী—দিগ্‌গজ এদের নাম। এই দিগ্‌গজদের পিঠের উপরেই পৃথিবীর অবস্থান।

হাসছ তোমরা? তা হাসতে পার। কারণ তোমরা এখন বিজ্ঞান পড়েছ, পৃথিবী যে কোথায় কী ভাবে আছে, তা আর জানতে বাকী নেই তোমাদের। কিন্তু বিজ্ঞান বা কোনরকম জ্ঞানই যখন মানুষের ছিল না, সেই অতি-প্রাচীন কালে ছেলেবুড়ো সবাই জানত—

যা জানত, তা ঐ গোড়াতেই বলেছি; কাছিমের পিঠে হাতী, আর হাতীর পিঠে পৃথিবী—বিশাল একখানা চ্যাপ্‌টা থালার মত—নীরেট পৃথিবী, কেউ বলত গোল, কেউ-বা বলত চৌকোণা।

দিন যায়, লোকের ধারণাও পাল্‌টায়। হাতী ও কাছিমের কথা বাতিল হয়ে গেল ক্রমশঃ। দেখা দিল নতুন মত—তা হ'ল এই যে, পৃথিবীটা কারও উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই, ওটা ভাসছে। এক অকূল মহাসাগরের জলে ভেসে রয়েছে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায়, ঠিক যেমন একটি পদ্মপাতা ভেসে থাকে পুকুরের জলে। যাতে স্রোতে ভেসে না যায় বা ঢেউয়ের আঘাতে দূরে গিয়ে না পড়ে, তার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ভাসমান পৃথিবীর তলা থেকে শিকড় নেমেছে অসংখ্য। সে-সব শিকড় একেবারে মহাসাগরের তলার মাটিতে গিয়ে প্রবেশ করেছে, যেমন ক'রে বটগাছের ঝুরি উপর থেকে নেমে মাটির ভিতর এসে ঢোকে।

চীনদেশের লোকের এইরকমই বিশ্বাস ছিল সেদিন পর্য্যন্ত। বাড়তির ভাগ তারা মনে করত—তাদের নিজের দেশটি হ'ল সারা পৃথিবীর ঠিক মাঝখানটিতে—তার সীমান্ত থেকে এদিকে ওদিকে বেরিয়ে গিয়েছে আরও সব নানান্ দেশ, সেগুলি পেরিয়ে গেলে অবশেষে পৌঁছানো যাবে সেই অকূল মহাসাগরের তীরে; অবশ্য পৌঁছানোটা খুব সহজ কাজ নয়, কারণ সাগরকূলে বাস করে ভয়াবহ সব দৈত্য-দানা আর বিদঘুটে সব জন্তু-জানোয়ার, মানুষ দেখতে পেলেই তাকে তারা টপ্ ক'রে মুখে ফেলে দেবে।

কিন্তু পৃথিবীটা যদি একটা চ্যাপ্‌টা থালার মতোই হয়, আকাশ তা হ'লে কী? সে-জিজ্ঞাসারও জবাব ছিল। একটা বল মাঝামাঝি চিরে ফেললে তার ভিতর দিকটা যে রকম হয়, আকাশও সেই রকম একটা ফাঁপা আধা-গোল জিনিষ। একটা বড় বাটি উল্‌টো ক'রে উঁচুতে ধরলে যেমন হয়—তেমনি আর কি!

কিন্তু আকাশকে অত উঁচুতে ধ'রে রেখেছে কে? পৃথিবী ত নয়ই, কারণ পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের ত কোনো যোগই দেখতে পাওয়া যায় না।

এরও জবাব ছিল। পৃথিবীর চারিদিকে বিশাল সব স্তম্ভ রয়েছে, সেই সব স্তম্ভের মাথার উপরেই আকাশের অবস্থান।

কিন্তু স্তম্ভগুলো দাঁড়িয়ে আছে কার উপর? এ প্রশ্নের আর জবাব দেয় নি কেউ।

প্রশ্ন আরও একটা ছিল। সূর্য্য সকালে পুব দিকে ওঠে, সন্ধ্যায় পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। তা হ'লে পরের দিন সকালে সে আবার পুব আকাশে হাজিরা দেয় কেমন ক'রে? পৃথিবীটা ভেদ ক'রে ত ফিরে যেতে পারে নি? তবে কি তলা দিয়ে গেল? তাও ত সম্ভব নয়! কারণ পৃথিবী ত একটা নীরেট বস্তু, তার নীচের দিকটা ত শক্ত ক'রে আঁটা রয়েছে বিশ্বজগতের তলার সঙ্গে! সেখান দিয়ে গ'লে বেরিয়ে যাওয়ার পথ ত নেই!

তা হ'লে?

—এই 'তা হ'লে'র জবাব দেওয়ার জন্য নানা গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীনকালে। একটা হ'ল এই যে, পশ্চিম দিকে যেতে যেতে সূর্য্য অবশেষে গড়িয়ে প'ড়ে যায় মহাসাগরের জলে। জলের ভিতর আগুন থাকতে পারে না, কাজেই গোটা সূর্য্যটাই নিভে যায় ক্রমশঃ। তারপর দেবতারা লেগে যান নতুন একটা সূর্য্য তৈরী করতে। সারা রাত মেহনত ক'রে তাঁরা সূর্য্য গড়েন, আর ভোরবেলা তাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন পুব-আকাশে।

সূর্য্য-দেবতা অ্যাপোলো

এ-গল্পটা এতই জবড়-জং যে সেই আদ্যি-কালের লোকেরাও বেশী দিন এটা সহ্য করতে পারে নি। কাজেই নতুন গল্প তৈরী হ'ল এইরকম যে, জলে-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভল্‌কান' নামে এক দেবতা তাকে নৌকোয় তুলে নেন; তারপর সমুদ্রে সমুদ্রে সারারাত নৌকো বেয়ে রাত্রির ভিতরই অর্দ্ধেকটা পৃথিবী ঘুরে ভোর-নাগাদ এসে পৌছান পুব-সাগরে। সেইখান থেকে তিনি সূর্য্যটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন আকাশের পানে, আর আকাশপথে পা দিয়েই সূর্য্য আবার পশ্চিম-মুখী হয়ে দে ছুট্—দে ছুট্—

গ্রীকেরা ছিল ভাবুক, আগুনবরণ সূর্য্যকে রোজ আকাশপথে ভ্রমণ করতে দেখে তারা ওকে দেবতা ব'লে কল্পনা ক'রে বসল। এই দেবতাকে তারা নাম দিল অ্যাপোলো। আগুনরথে চ'ড়ে অ্যাপোলো আকাশ অতিক্রম করেন, রথ টেনে নিয়ে যায় সাতটি ঘোড়া; সে সাত ঘোড়া আর কিছুই নয়, সূর্য্যেরই আলোকের ভিতরকার সাতটি রং।

রোজ রোজ আবার ভাল লাগে না অ্যাপোলোর একই পথে ছুটোছুটি করতে। তখন তিনি অন্য-কোনো দেবতাকে নিজের রথে চড়িয়ে দিয়ে নিজে বিশ্রাম নেন দুই একটা দিন। তখনই বাধে গোলযোগ, সূর্য্যরথের নতুন আরোহী ঠিক মত রথ চালাতে পারেন না হয়ত, বিপথে গিয়ে পড়েন। যেসব রঙীন মেঘ রোজ অ্যাপোলোর পিছনে পিছনে আসে ছাতাবরদার ভৃত্যের মত, তারা সেদিন সুযোগ পেয়ে রথখানাকেই ঢেকে ফেলে, কড় কড় শব্দে ভয় দেখায় রথের অশ্বগুলিকে, চারিদিকে ছেয়ে আসে নিবিড় অন্ধকার।

সূর্য্যদেবতা ব'লে এই-যে একজন শক্তিমান দেবতার কল্পনা করা, এটা কিন্তু শুধু গ্রীকদের ভিতরই আবদ্ধ ছিল না। ভারতের বৈদিক ঋষিরা, ব্যাবিলনের আদিম যুগের পুরোহিতেরা, অনেকেই সূর্য্যের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর পূজার জন্য নিয়ম-কানুনও গ'ড়ে তুলেছিলেন নানান্ রকম।

সূর্য্যের গতি আর প্রকৃতি লক্ষ্য করতে করতে উত্তর অঞ্চলের লোকেরা আবার নতুন-রকমের একটা কল্পনা ক'রে বসল। সূর্য্য উদয় হবার পরেই তার আলোকের ছটা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। তারা দেখে আর বলাবলি করে—'এ ত দেখছি মস্ত একটা গাছের মত। চারিদিকে ডালপালা ছড়িয়ে গেছে আকাশ জুড়ে!' 'বিশ্ব-মহীরুহ' নামের এ-থেকেই উৎপত্তি। সূর্য্যের গতিপথ হ'ল এ-মহাবৃক্ষের কাণ্ড, সূর্য্যের আলোক-ছটা হ'ল এর শাখা-প্রশাখা, মেঘেরা হ'ল এর পাতা, আর সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রেরা সবাই হ'ল এর ফল। একটি জার্ম্মাণ গানে এর যে-বর্ণনা আছে, তার ভাবার্থ এই রকম—

"মহামহীরুহ উঠেছে উপর পানে,
নন্দনবনে কী শোভা মরি!
পাতালের তলে নেমেছে ইহার মূল,
শির উঠিয়াছে স্বর্গ 'পরি।
স্বর্গে যেথানে ভগবান সমাসীন
সোনালী আলোর ঠিকরে জ্যোতি,
ইহারি শাখায় ঝ'রে ঝ'রে পড়ে সেথা
উষার কিরণ মুকুতা মোতি;
সারা ধরণীর সব ঠাঁই এর শাখা
বরিষণ করে শিশিরকণা,
শিশির তো নয়, সে যে গো স্বর্গসুধা,
পান করে সুখে মর্ত্ত-জনা।

খ্রীষ্টানেরা ভগবান যীশুর জন্মোৎসবে একটি চিরহরিৎ গাছের শাখা নিয়ে তাতে নানারকম সুখাদ্য, খেলনা ও উপহার সামগ্রী ঝুলিয়ে দেন। তাকে বলা হয় ক্রিস্‌মাস্-তরু। এই তরুর ধারণা খুব সম্ভব বিশ্বতরু-কল্পনা থেকে ধার করা হয়েছে। বিশ্বতরু সম্বন্ধে গল্পও প্রচলিত আছে নানারকম। এর এক শাথায় বাস করে ঈগল পাখী। আর এর শিকড়ে শিকড়ে জড়িয়ে আছে এক মহাসর্প। ঈগল পাখীতে আর সাপেতে চিরদিন কলহ বিবাদ যুদ্ধ; দু'জনের ভিতর সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করে এক ক্ষুদে কাঠবিড়ালী, গাছের মাথা থেকে মূল পর্য্যন্ত তার ছুটোছুটির আর বিরাম নেই। আরও নানা প্রাণী বাস করে বিশ্বতরুর বিভিন্ন শাখায়, তারা যখন এ ডাল থেকে ও ডালে চলাচল করে, তখন বিজলী চম্‌কায় আকাশ জুড়ে। চমকটা যখন ধনুকের আকারের হয়, তখন বুঝতে হবে চলাচল করছে সাপ। আঁকা-বাঁকা হ'লে বুঝতে হবে ওটা ছাগল। খ্রীষ্টান হবার আগে জার্ম্মাণ দেশের লোকেরা বিশ্বাস করত—দেবতার সংখ্যা অগুণ্‌তি, আর প্রত্যেক দেবতার প্রিয় জন্তু আছে এক একটি। যে-জন্তুর মূর্ত্তি উৎসব তরুর ডালে ঝোলা'তে ভুল হবে, সেই জন্তুরই মুরুব্বি-দেবতা দারুণ

রকম রেগে যাবেন, এবং অনর্থ বাধাবেন নানান রকমে। তাই দুনিয়ায় যত-রকম প্রাণী আছে, সবাইয়েরই মূর্তি ঠাঁই পেতো তাদের উৎসব-তরুতে।

এমনি সব গল্প। এক এক দেশে এক এক রকম গল্প। আজব, আজগুবি, চমক-দেওয়া গল্প রকম-রকম। আজ আমরা আকাশ-পৃথিবীর স্বরূপ সত্যি সত্যি কতকটা বুঝেছি; সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝেছি যে, আগের দিনের আজব গল্পগুলির চাইতে বর্ত্তমানের সত্যি-গল্প অনেক বেশী চমকপ্রদ। পুরোণো গল্পে মজা ছিল, কিন্তু তা থেকে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক ঠিক মত বোঝা যেত না। তাই বুদ্ধিমান লোকেরা মনোযোগ দিল আকাশের ঐ উজ্জ্বল আলোকপিণ্ডগুলির দিকে। ওদের নাম ছিল এ্যাষ্ট্রন (ষ্টার) বা তারা। তাই থেকে ঐ সব বুদ্ধিমান লোকের নাম দাঁড়িয়ে গেল এ্যাষ্ট্রনমার বা তারা-সন্ধানী।

পৃথিবী কাঁধে অ্যাটলাস্
[পৃঃ ৯৯

এই তারা-সন্ধানীর দলের প্রথম প্রশ্ন ছিল—যে-জিনিষটা নড়ছে, সেটা কী? কিছু-একটা নড়ছে ত বটেই! দিন বা রাতে আকাশের দিকে তাকালেই সে-বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। কিন্তু কী সেটা, আর কেমন ক'রে সেটা নড়ে বা ঘোরে? গবেষণার ফলে ক্রমশঃ বুঝতে পারা গেল—সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা—সবাইয়েরই গতি বেশ নিয়মিত। বৎসরের ছয়টি ঋতু (কোথাও-বা চারিটি) নিয়মিত সময়েই আসে। দিন রাত একটা নিয়ম-অনুসারেই বাড়ে কমে। চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি আসা-যাওয়া, সেটাও খেয়ালখুশীর ব্যাপার নয়; সব-কিছুরই বাঁধাধরা নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়মটি ভাল ক'রে বুঝবার পরে ভবিষ্যতের ঘটনাও আগে থেকে ব'লে দেওয়া সম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল তারা-সন্ধানীদের পক্ষে—যথা, কাল চাঁদ উঠবে ষোল ভাগের পাঁচ ভাগ বা কাল চাঁদ মোটে উঠবেই না ইত্যাদি।

গ্রীক জ্যোতিষীরা তারকাদের গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু সব-কিছু নয়। তাঁদের সেই ব্যর্থতার কারণ ছিল এই যে, প্রাচীনকালের একটি ভুল বিশ্বাস তাঁরা আঁকড়ে ধ'রে ব'সে রইলেন। সে ভুলটি কী?—না, আমাদের এই পৃথিবীই হ'ল বিশ্বজগতের মধ্যবিন্দু, আর এই পৃথিবী হ'ল চিরস্থির, অনড়! পৃথিবীর নীচে দিয়ে কিছু যেতে পারে না। এ-ভুল তাঁদের ভেঙ্গেছিল। অনেকের মাথায় এ-ধারণাও উঁকি দিয়েছিল যে, পৃথিবীর উপরিভাগ হয়ত সমতল নয়, 'বল'-এর মত সম্পূর্ণ বা ডিমের মত আংশিক গোলাকার। বিশ্বজগৎকে তাঁরা কল্পনা করলেন একটা বিরাট ফাঁপা গোলক ব'লে। ঐ ফাঁপা জায়গাটাতে এখানে ওখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা সব শক্ত ক'রে বাঁধা রয়েছে। পৃথিবীও বাঁধা রয়েছে ঠিক মাঝখানটিতে। পৃথিবী স্থির হয়ে রয়েছে, আর ঐ বিরাট গোলক পৃথিবীর চারিদিকে ক্রমাগতই ঘুরছে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র নিয়ে।

পৃথিবী স্থির, অনড়। কিন্তু কেন? এ-প্রশ্নেরও উত্তর ছিল। অ্যাটলাস্ নামক দৈত্যের কাঁধের উপর বসানো রয়েছে পৃথিবী। বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দৈত্য; আর তাকে বেষ্টন ক'রে ঘুরছে সেই ফাঁপা গোলক, যার গায়ে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রেরা শক্ত ক'রে বাঁধা।

এই 'অ্যাটলাস্' নামটি সব ছেলেরই পরিচিত হওয়ার কথা। এর অর্থ দাঁড়িয়েছে মানচিত্রের বই। মার্কেটর নামে এক ভদ্রলোক সেকালে ভূচিত্রাবলী ছাপতেন। তাঁর ভূচিত্রের বইয়ের মলাটে তিনি অ্যাটলাস্-দৈত্যের ছবি দিয়েছিলেন। দৈত্য যেন পৃথিবী কাঁধে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; মাথাটা নীচুপানে ঝুঁকে পড়েছে পৃথিবীর ভারে।

ঐ দৈত্যের নাম অনুসারে পৃথিবীর সব ভূচিত্রের বইয়েরই নাম এখন 'অ্যাটলাস্'।

এই যে ফাঁপা গোলকের ধারণা, এতে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রদের গতিবিধির কতকটা অর্থ পাওয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই অর্থের ভেতর অনর্থও ধরা পড়ল অনেকখানি। যা সবাই জানে, এমন কোন-কোন ব্যাপারের সঙ্গে জ্যোতিষীদের অনুমান খাপ খেতে চাইল না। যেমন ধর, সূর্য্য চন্দ্র যদি পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে ঘোরেই, ঠিক সময়ের পরিমাপ-অনুযায়ী ঘোরে না কেন? চব্বিশ ঘণ্টায় সূর্য্য-একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। কিন্তু সেই সূর্য্যেরই আবার নক্ষত্রমণ্ডলীকে বেষ্টন ক'রে ঘুরে আসতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন লাগে। আর চন্দ্র? তার লাগে মাত্র সাতাশ থেকে ত্রিশ দিন!

এই গোলমালের ভেতর সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করলেন টলেমী। প্রায় আঠারো শো বৎসর আগে তাঁর জন্ম—মিশর দেশে। তিনি যে-ধারণা করলেন বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে, তা ভয়ানক জটিল। তাঁর মত হ'ল এই যে, যে-সব তারকা আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে, তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করে আর একদল তারকা, যারা আমাদের দৃষ্টির বাইরে। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা গতিপথ রয়েছে, কোনটা কিছু নিকটে, কোনটা কিছু দূরে। মোটের উপর এই গোলক ধাঁধার মত ব্যাখ্যা সেকালের অন্য পণ্ডিতেরা বুঝতে পারেন নি। টলেমীর মৃত্যুর প্রায় হাজার বছর পরে স্পেনের রাজা দশম আল্‌ফান্‌সো ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন—"আমি যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হ'তাম, বিশ্বজগৎকে সাজিয়ে গুছিয়ে জায়গা মতো বসাবার নিয়মটা এর চেয়ে ঢের সহজ হ'ত।"

আল্‌ফান্‌সোর ঠাট্টা যে অসঙ্গত হয় নি, তা আরও তিন শো বছর পরে প্রমাণ করলেন কোপার্ণিকাস বা নিকোলাস কোপার্ণিক। পোলাণ্ড দেশে এঁর বাড়ী, জন্ম ১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কলম্বাসের সমসাময়িক ইনি। এঁর বাবা ছিলেন কারবারী লোক, গরীব ছেলেকে লেখা-পড়া শেখানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কিন্তু নিকোলাসের কাকা ছিলেন এক বিশপ বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনি এই গরীব ভাইপোটির শিক্ষার ভার নেন।

শিক্ষা শেষ ক'রে কিছুদিন রোম-নগরে শিক্ষকতা করেন কোপার্ণিকাস। তারপর পিতৃব্যের মত নিজেও ধর্ম্মযাজক হয়ে যান এবং অবসরকালে গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে সুরু করেন। টলেমীর কল্পনা যে ত্রুটিবহুল, এ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বহুদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করলেন তিনি। অবশেষে তিনি আলোক দেখতে পেলেন। তাঁর মনে হ'ল—পৃথিবী হয়ত জগতের কেন্দ্রবিন্দু নয়। হয়ত পৃথিবীর চারিদিকে সব-কিছু ঘোরে না, পৃথিবী নিজেই হয়ত ঘোরে। বহু বৎসর এই নিয়ে চ'লল তাঁর গবেষণা। অবশেষে তিনি প্রমাণ করলেন যে পৃথিবী চব্বিশ

ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক ত খায়ই, তা ছাড়া অন্য কয়েকটি গ্রহের মত নিজেও সূর্য্যের চারিদিকে ক্রমাগত ঘোরে।

কোপার্ণিকাসের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বিশ্বজগৎ যে কত বড়ো, কোপার্ণিকাসের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পরেই সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছেন। "জ্যোতিষ্কের আবর্ত্তন" নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর মতবাদ বর্ণনা ক'রে যান; বইখানি অবশ্য ছাপা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। তখন এর প্রতিবাদও অনেকে করেছিলেন। কিন্তু কোপার্ণিকাসের শিষ্যেরা সে-সব প্রতিবাদ খণ্ডন ক'রে গুরুর মত প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই শিষ্যদের মধ্যে গ্যালিলিও ছিলেন অন্যতম।

কোপার্ণিকাসের মতবাদেও ভুলত্রুটি ছিল, সে-সব সংশোধন করেন নিউটন। মাধ্যাকর্ষণশক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে সৌরজগতের গঠনপ্রণালী তিনিই পৃথিবীর লোককে নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

● জান কি?

১নং চিত্র। ৫,০০০ হাজার বছর আগে এই হার্প নামের বাদ্যযন্ত্রটি লোকে জানত। বয়সে প্রাচীন হলেও আধুনিকরা এখনও এটির আদর করে থাকে।

২নং চিত্র। যুক্তরাষ্ট্রে যদি ৫৭,০০০,০০০ মোটর গাড়ী প্রমোদভ্রমণে বেরোয়, তারমধ্যে ২০,০০০,০০০ গাড়ীর চালক নারী। সেখানে নারীরা প্রায় পুরুষের মত অগ্রগামী।

৩নং চিত্র। স্বল্প উপার্জ্জনে যথাসম্ভব দান। ডাক্তার গড্‌ফ্রে নাস একজন অস্ত্র-চিকিৎসক। তিনি একটি অস্ত্রোপচার গবেষণাগার নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

আজব সহর কোলকাতা

—ব্রহ্মচারী অতুলকৃষ্ণ

যেতে যদি চাও বাপু, কোলকাতা সহরে
আগে পিছে দেখে চলো, দিনে আর দুপুরে ;
পৃথিবীর যত লোক জড়ো আজ সেখানে
ব্যবসার ফাঁদ পাতে, খোঁজ রাখো ক'জনে ?
বড় বড় রাস্তায় ছুটে চলে ট্রাম-বাস
মুটে আর মজুরের ভীড় জমে বারো মাস ;
সাইকেল, রিক্সা টেনে চলে অবিরাম
লরি আর মোটরের নাই যে রে বিশ্রাম।
এতটুকু বে-হুঁস হলে কোন কথা নাই
বেমালুম চাকাতলে প'ড়বে যে ভুল নাই ;
ফুটপাতে চলো যদি ভীড় তবু কম নয়
ধাক্কার চোটে তবে হবে প্রাণ সংশয়।
চানাচুরওয়ালার ডাক বড় মিষ্টি,
তা'র দিকে যদি দাও একবার দৃষ্টি
তাহ'লেই গেছো তুমি একদম হারিয়ে ;
পথ খুঁজে পাওয়া দায়, যাবে মাথা গুলিয়ে।
কোলকাতা সহরের রাস্তার ঠিক নাই
অলিগলি চৌমাথা গোল বাধে হামেশাই ;
আজব এ-সহরের তাজ্জব কাণ্ড—
এই বুঝি ভেঙ্গে যায় দধিটার ভাণ্ড।
বুকে যদি থাকে বল পিছপাও হয়ো না
ঠিক পথ ধরো তুমি ভুল পথে যেও না॥

বালকের শক্তি-সাধনা

(সত্য ঘটনা)

—শ্রীকাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকার এক বড় কারখানার ভিতরে হঠাৎ একটি কিশোর বালক আস্তিন গুটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে "খবরদার"—

বৃদ্ধ পিতা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে খপ্ করে তার হাতখানা ধ'রে ফেলে, জোড় হাতে সাহেবের দিকে করুণা ভিক্ষা ক'রে বলে, "ছোট ছেলে সাহেব, কিছু বোঝে না হুজুর, মাফ্ করুন।"

লালমুখো সাহেব ক্ষমার বদলে এবার বালকটির পেটে এক বুটের লাথি মারে। বালকটি গড়িয়ে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। সাহেব ঠিক এর কিছু আগেই ঐ বৃদ্ধকেও ঘুসি ও বুটের লাথি মেরে ধরাশায়ী করেছিল। তারই প্রতিবাদের ফলে বালকটিকেও ঐ শাস্তি পেতে হোল। অতঃপর ক্রোধে গর্জ্জন করতে করতে, "শুয়ার কা বাচ্চা" বলে সম্বোধন ক'রে সাহেব প্রস্থান করে।

বৃদ্ধ আর চোখের জল রোধ করতে পারে না। দুই চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। করুণাময় যীশুর উদ্দেশে উপর দিকে হাত জোড় ক'রে- কি যেন নিজের মনেই নালিশ করে, তারপর অঞ্জলিভ'রে জল এনে হতচেতন পুত্রের মুখেচোখে দিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে বালকটির সব কথাই মনে পড়ে। সে তখন পিতাকে বলে, "আচ্ছা—এর প্রতিশোধ আমি নেবই।"

পিতা ভয় পেয়ে বলেন, "না বাবা, আমরা যে কালা আদমি আর শ্বেতাঙ্গরা যে আমাদের প্রভু—মালিক ; আমরা ওদের গোলাম, ওদের লাথি ঝাঁটা খেয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। তাছাড়া যে গতি নেই আর।"

বৃদ্ধ বহুদিন থেকেই এই কারখানায় কাজ করে। কিন্তু তার মজুরী কোন দিনই বাড়ে না। আজকাল বয়স হয়েছে তেমন খাটবার সামর্থ্য নেই, তাই মাঝে মাঝে একটু-আধটু বিশ্রাম নিতে হয়। এই রকম বিশ্রাম নেবার সময়ই বুড়োকে দেখতে পেয়ে সাহেব তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ঘুসি আর লাথি মেরে বুঝিয়ে দেয় যে, কাজ করতে এসে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। বৃদ্ধ পূর্ব্বের মত খাটতে পারে না বলে তার ছেলেকেও সঙ্গে এনে কাজ করিয়ে নেয়। অবশ্য তার জন্য বাড়তি পারিশ্রমিক

কিছুই পায় না। সারাদিন পিতা-পুত্রে নিদারুণ পরিশ্রম করে। অথচ সপ্তাহের শেষে যা মজুরী পায় তা অতি সামান্য, বহুকষ্টে আধপেটা খেয়ে সংসার চলে। মাঝে মাঝে ঘুসি আর লাথিও জোটে। সাহেব আজকাল নূতন Boxing খেলা শিখছেন তারই নমুনা দেখিয়ে দেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর গির্জ্জা থেকে সকলে চলে গেছে, কিন্তু ঐ কিশোর বালক একা মাথা হেঁট ক'রে কাঁদছিল। কালা-আদমিদের আলাদা গির্জ্জা, কিন্তু তার ধর্ম্মযাজক ছিলেন একজন উদার ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। বালকটিকে কাঁদতে দেখে তিনি তার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, "কি হয়েছে বাবা ?"

এক ঘুসিতে চোখ ফেটে গেছে,...এমনি করেই পরবর্ত্তী জীবনে সে প্রতিশোধ নেয় শ্বেতাঙ্গদের ওপর।

বালকটি কাঁদতে কাদতেই তার মনের দুঃখ আর সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করে। বৃদ্ধ পিতাকে বিনাদোষে লাথি মারাতে সে ক্ষেপে গিয়েছিল—এর প্রতিশোধ নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও সে ব্যক্ত করে। সে একথাও জানায় যে, সেদিন থেকে সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের উপরেই সে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে আর তাদের ওপর দারুণ ঘৃণায় তার সর্ব্বশরীর রি—রি করতে থাকে।

ফাদার সব শুনে বালকের গভীর মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করেন। তিনিও এই শ্বেতাঙ্গ মালিকদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়েছেন, আর অনেক লড়াইও করেছেন তার বিরুদ্ধে; কিন্তু কিছুই ক'রে উঠতে পারেননি।

বালককে বুঝিয়ে ফাদার বলেন, "ওরা হ'ল মালিকের জাত, অত্যাচার করা ওদের মজ্জাগত দোষ—তার প্রতিশোধের কল্পনা করাও বাতুলতা—প্রতিবাদ করতে গেলেও ওরা তোমাদের চামড়া ছাড়িয়ে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।"

কিন্তু বৃথা,—বালক কিন্তু এই অত্যাচার সহ্য করবে না, তার প্রতিকার চাই-ই।

অনেক চিন্তা ক'রে ফাদার বলেন যে, প্রতিশোধ নেবার একটা রাস্তা অবশ্য আছে যদি সে একান্তই প্রতিশোধ নিতে চায়। গভীর মনোযোগ আর একনিষ্ঠ সাধনায়

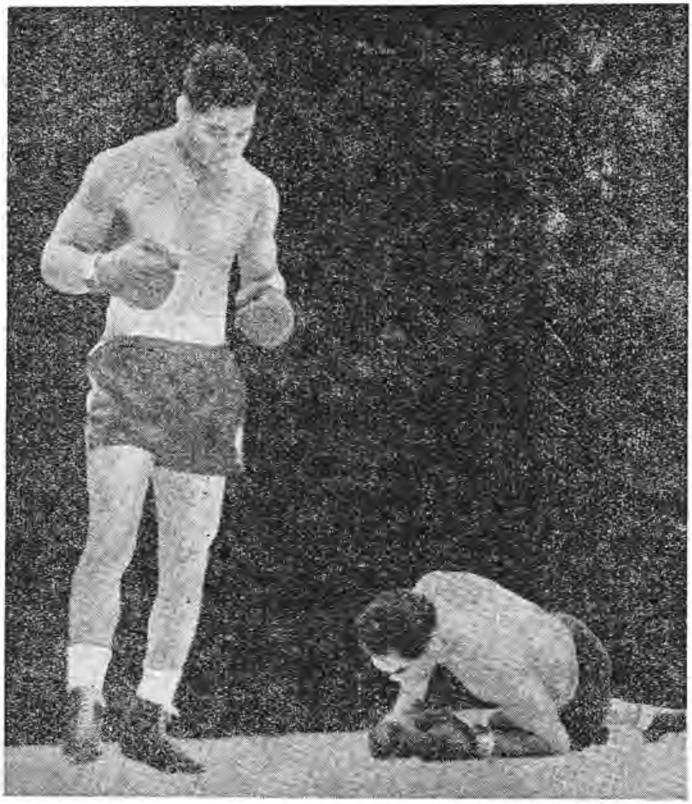

শক্তিসাধনার ফলেই সম্ভব হ'ল বিশ্বজয়ী মুষ্টিযোদ্ধাকে পরাজিত করা।

শক্তি-সঞ্চয় ক'রে, মুষ্টিযুদ্ধে ওদের আহ্বান ক'রে, ঘুসির বদলে ঘুসি মেরেই প্রতিশোধ লওয়া চল্‌বে।

এমন একটা সহজ উপায় পেয়ে ছেলেটি সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, যেন হাতের কাছেই চাঁদ পেয়ে গেছে। আর পরদিন থেকেই প্রবল উৎসাহে Boxing শিখতে লাগল।

উত্তরকালে এই বালকই শত শত শ্বেতাঙ্গের কারও নাক-চোখ ফাটিয়ে, কারও চোয়াল গুঁড়ো ক'রে, আবার কাউকে একেবারে ভবনদী পার ক'রে, তার পিতার

লাঞ্ছনার ভীষণ প্রতিশোধ নেয়। বিশ্ববিখ্যাত এই মুষ্টিযোদ্ধার নাম ক্রমেই সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ পিতার অপমান ও কালা-আদমির উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ সে কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নেয় তার একাগ্র শিক্ষা ও সাধনার বলে।

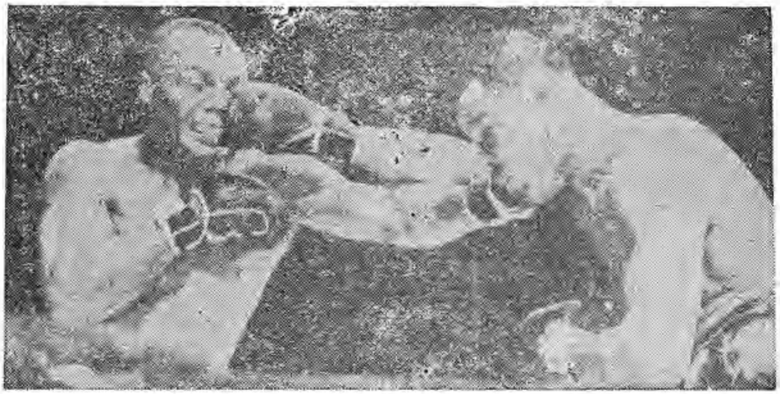

শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লড়াই! জো ওয়ালকট্ বনাম জো লুই। এঁরা দুজনেই জাতিতে নিগ্রো।

তার নাম তোমরা হয়ত অনুমান করতে পার। তিনিই বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা মিঃ জো লুই। সকল বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধাদের একে একে পরাস্ত ক'রে তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বা বিশ্ব-হেভি-ওয়েট্ চ্যাম্পিয়নশিপ্ লাভ করেন। তাঁর বিরাট পেশীবহুল সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব আর অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখতে সহস্র সহস্র লোক দর্শনী দিয়েও স্থান পেত না। এইভাবে তিনি প্রভূত যশঃ ও কোটী কোটী ডলার উপার্জ্জন করেন। একবার তাঁর ইন্‌কাম-ট্যাক্স ধার্য্য হয় প্রায় এক কোটী ডলারের উপর। তিনি এখন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হ'তে অবসর নিয়েছেন। জাতিতে তিনি নিগ্রো। বর্ত্তমানে বিশ্ব-হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ্ লাভ করেছেন মিঃ ফ্রয়েড প্যাটার্সন। ইনিও নিগ্রো এবং বয়স মাত্র ২১ বৎসর।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই।

রাজা ও কবি

—প্রবীরকুমার

এক যে ছিলেন রাজা—

হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক-লস্কর সেপাই-পল্টন কোন কিছুরই অভাব নেই। রাজা নিজেও মস্ত বড় বীর, নানা দেশ জয় ক'রে ধনে রত্নে ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে ফেলেছেন। চারদিকে জয়জয়কার ; রাজার নানা গুণের কথা সারা পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে ফেরে।

ফিরবে নাই বা কেন ? রাজা তো শুধু রাজা নন, শুধু বীরও নন, তিনি আবার কবি। নিজে ত কবিতা লেখেনই, অন্য যারা কবিতা লেখে, তাদেরও করেন প্রচুর সমাদর। ভাল কবিতা যে-কেউ এসে শোনাক, তাকে অদেয় রাজার কিছুই থাকবে না। "কী পেলে তুমি সুখী হও কবি ?"—প্রশ্ন করবেন রাজা। কেউ হয়ত বলবে—"অর্থ দিন মহারাজ !" অমনি লক্ষ মোহর দান করবেন রাজা। কেউ হয়ত প্রার্থনা করবে—"একটু ভূসম্পত্তি পেলে ভাল হয় মহারাজ !" রাজা হয়ত একটা রাজ্য-খণ্ডই দিয়ে বসবেন তাকে। দিতে পারলেই যেন রাজার আনন্দ।

মন্ত্রীরা ভয় পেয়ে গেলেন। নানা দেশ জয় ক'রে বহু অর্থই রাজা এনেছেন বটে, কিন্তু এভাবে ক্রমাগত দান করতে থাকলে ভাণ্ডার খালি হ'তে ত বেশী দিন লাগবে না ! তারপর ? নতুন ক'রে দিগ্বিজয়ে বেরুবার বয়স আর নেই রাজার। রাজ্যটা যে দেউলে হ'য়ে যাবে।

ভয়ে-ভয়ে রাজাকে শুনিয়ে দেওয়া হ'ল কথাটা। রাজা বুদ্ধিমান, মন্ত্রীরা যে অন্যায় কথা বলেন নি, তা সহজেই বুঝলেন। কিন্তু কেমন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, কবিকে নিরাশ করবার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। কবি—অর্থাৎ সরস্বতীর বর পেয়ে ধন্য হয়েছেন, এমন এক মহামানব। তিনি এসে কবিতা শুনিয়ে যাবেন—এটাই ত রাজার পরম ভাগ্য ! তারপর কবিতা শোনাবার বিনিময়ে তিনি যখন কিছু চাইবেন, কোন্ মুখে রাজা তাঁকে বলবেন—"না কবি, পারব না দিতে ?" তার চাইতে রাজার মৃত্যু ভাল।

দান চলতেই থাকে, ভাণ্ডার খালি হ'য়ে আসে।

মন্ত্রীরা চোখে দেখেন সর্ষে ফুল।

প্রধান মন্ত্রীর আহার নিদ্রা ঘুচে গেল।

নাঃ, দেশটাকে বাঁচাতে হ'লে প্রধান মন্ত্রীকে শক্ত হতেই হবে।

তিনি গিয়ে রাজাকে বললেন —"মহারাজ, আমি পদত্যাগ করছি।"

রাজা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মন্ত্রীর পদত্যাগ ? সেটা স্বীকার ক'রে নেওয়ার চেয়ে রাজার নিজেরই পদত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। তিনি বহুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন—"না মন্ত্রিবর, তার দরকার নেই। আমি দান বন্ধ করব। অর্থাৎ, কবিতা শোনাই বন্ধ করব ; কারণ, শোনা মানেই দান করা। কবিতা শুনব অথচ কবিকে কিছু দেব না, এটা অসম্ভব !"

সে ত পরের কথা পরে। মন্ত্রী ভাবলেন—"এখন ত দেশটা বাঁচুক !" দান বন্ধ ক'রে মন্ত্রী হাঁফ ছেড়ে নিজের দপ্তরে গিয়ে বসলেন।

দিনের পর দিন কবিরা আসেন আর রাজবাড়ীর দেউড়ী থেকে ফিরে যান। আজ রাজার অসুখ, কাল রাজার শিকারে যেতে হবে। তারও পর দিন ?—তার পরদিন গুরুতর রাজকার্য্য রয়েছে, রাজা মন্ত্রীদের নিয়ে গোপন মন্ত্রণায় ব্যস্ত।

কবিতা শোনানোর পাট উঠে গেল। কবিরা আর আসেন না রাজবাড়ীতে। যাঁদের ঘরে খাবার আছে, তাঁরা নিজের মনে লেখেন, নিজে নিজেই পড়েন, তারপর জমা করেন সিন্দুকে। আর যাঁদের 'অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ', তাঁরা লেখা ছেড়ে মুদীর দোকান বসালেন কিংবা দেশান্তরে চ'লে গেলেন—চুরি-চামারি করবার জন্য।

তা তাঁরা যেতে পারেন, মন্ত্রীর তাতে কিছু আসে যায় না। রাজকোষ শূন্য না হ'লেই তিনি খুসী।

কিন্তু বেশীদিন খুসী থাকা মন্ত্রীর ভাগ্যে নেই। রাজকোষ যত ভ'রে ওঠে, রাজার মুখ তত মলিন হয়ে আসে। কোন নালিশ নেই রাজার, কিন্তু তাঁর রসের পিয়াসী মনটি কাব্যরসের অভাবে শুকিয়ে ওঠে দিনের পর দিন, যেমন ক'রে জলের অভাবে শুকিয়ে যায় ফুলন্ত গোলাপলতা।

মন্ত্রীর চোখে তা ধরা পড়ল। তাঁর মনটা ব্যথায় ভ'রে উঠল। রাজাকে তিনি ভালবাসেন, ভক্তি করেন। দেশের ভালোর দিকে তাকিয়েই রাজার কাব্যবিলাসে বাধা দিতে হয়েছে তাঁকে। এতদিন আত্মপ্রসাদ ছিল তাঁর মনে। তিনি কর্ত্তব্য করতে পেরেছেন। নিজে কঠোর হ'য়ে রাজাকে বাধ্য করতে পেরেছেন নতিস্বীকারে। কিন্তু আজ সে আত্মপ্রসাদ কোথায় ? রাজার শুকনো মুখের দিকে চাইতে গেলেই মন্ত্রীর মনটা ধিক্কারে ভ'রে ওঠে।

মন্ত্রী চিন্তা করতে লাগলেন।

সাফ্ মাথা মন্ত্রীর। দু'দিন যেতে-না-যেতেই একটা ফন্দী এঁটে ফেললেন। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না। কবিরা আসবে, কবিতাও শোনাবে, কিন্তু অর্থ কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

মন্ত্রী সন্ধান নিতে লাগলেন—দেশে বিদেশে। শ্রুতিধর কেউ আছে ? একজন শ্রুতিধর দরকার হয়েছে মন্ত্রীর। শ্রুতিধর হ'ল তারাই—যারা একবার শুনেই একটা শ্লোক অবিকল মনে রাখতে পারে।

আছে কেউ শ্রুতিধর ? তাকে মোটা মাইনেতে চাকরি দেওয়া হবে রাজসভায়।

অনেক খুঁজে অবশেষে পাওয়া গেল। এক শ্রুতিধর সত্যিই এসে রাজসভায় অধিষ্ঠান করলেন। মোটা মাইনে—কাজ কিছুই নেই তাঁর। সভাসদেরা কাণাকাণি করতে লাগল। এ লোকটা নিশ্চয়ই মন্ত্রীর কোন নিজের লোক। আত্মীয়-পোষণের জন্য অন্যায় কাজ করতে এর আগে কেউ দেখেনি মন্ত্রীকে। কিন্তু আগে যে-দোষ ছিল না, তা কি কোনদিনই ঘটতে পারবে না ? আগে সাপে কামড়ায়নি ব'লে কোন দিনই কামড়াবে না—এ কথা কি বলা যায় ?

রাজসভায় যখন এমনি কাণাকাণি চলছে, তখন একদিন নগরের লোক চমকে উঠল। ঢেঁটরা পড়ছে রাজপথে।

অবাক কাণ্ড। ঢেঁটরা পড়ছে এই ব'লে যে, রাজা নতুন কবিতা শুনতে চান। সত্যিকার নতুন কবিতা যদি রাজাকে শোনাতে পারেন কোন কবি, তিনি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবেন। কিন্তু নতুন না হ'লে এক কাণাকড়ি না।

অবাক কাণ্ড! অন্য লোকের চাইতে বেশী অবাক হলেন রাজা নিজে। এ-ঢেঁটরার মানে কী? মন্ত্রী হঠাৎ এমন মত পরিবর্তন করলেন কেন? আর, পরিবর্তন যদি বা করলেন, একেবারে লক্ষ মোহর পুরস্কারই বা কেন ঘোষণা করতে গেলেন? অল্প-স্বল্প কিছু পেলেই ত কবিরা সন্তুষ্ট!

মন্ত্রীকে নিরিবিলিতে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

মন্ত্রী সবিনয়ে হেসে বললেন—"মহারাজ! কিছুদিন কবি-বিদায় বন্ধ রাখার ফলে রাজকোষ আবার পূর্ণ হয়েছে। এখন আবার কবিতা শুনুন না! তবে ঐ লক্ষ মোহর পুরস্কার? সত্যিকার ভালো, সত্যিকার নতুন জিনিষ পেতে হ'লে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে বই কি! কবিরা মোটা পুরস্কার পেলে নতুন সৃষ্টির দিকে ঝুঁকবে। এ-যাবৎ রাজসভায় যে সব কবিতা শোনা গিয়েছে, তা মন্দ নয় বটে; কিন্তু উঁচুদরের জিনিষও নয়, আর নতুনও নয়। মহারাজ রসিক লোক, তাই মামুলী বস্তু থেকেও রসগ্রহণ করে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। যারা মহারাজের মত কবিপ্রাণের অধিকারী নয়, তাদের কাছে ওসব মনে হয়েছে আজে-বাজে জিনিষ।"

"কিন্তু কোন্‌টা নতুন, কোন্‌টা পুরোণো, বোঝা যাবে কি ক'রে? আমি ত মশাই, এ-যাবৎ যা শুনেছি, সবই আমার কাছে নতুন ব'লে মনে হয়েছে।" আপত্তি তুললেন রাজা।

"তার জন্য চিন্তা কী? এর আগে ত মহারাজ কোনদিন সভাসদদের মতামত জানতে চান নি! এবার থেকে কোন কবি এসে কবিতা শোনাবার পর মহারাজ সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন—এ কবিতা আগে কেউ কোথাও শুনেছে কি না! যেটা কেউ শোনে নি, সেটাই নতুন ব'লে ধ'রে নেওয়া হবে।"

ব্যবস্থাটা পছন্দ হ'ল না রাজার। সভায় সাত-শো লোকের ভিতর ব'সে কবিতা শুনতে হবে? কবিতা শোনার পরিবেশ ও-রকম হওয়া উচিত নয়। কবিতা হ'ল প্রাণের জিনিষ। কবি নিজের প্রাণরসকে ভাষায় মূর্তি দিয়েছেন, শ্রোতাকেও তা শুনতে হবে প্রাণ দিয়ে। নিরিবিলিতে! একটি কবি আর একটি শ্রোতা। একজনের সুর আর একজনের হৃদয়ের তারে গিয়ে ঝঙ্কার তুলবে! তবেই ত কবিতার মানে বোঝা যাবে! তবেই ত সার্থক হবে কবিতা-রচনা আর কবিতা-শোনা! সভায় এক দল বাজে লোকের সম্মুখে কবিতার দাম যাচাই করা—এ যেন কাব্যলক্ষ্মীর অপমান!

কিন্তু মনের আপত্তি মুখে প্রকাশ করলেন না রাজা। এখন তাঁর অন্তর এত তৃষিত যে রস পেলেই সে বেঁচে যায়। সে-রস পরিচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে আসছে কিনা, অত-শত বিচার করতে গেলে এখন চলছে না!

ঢেঁটরার ফল ফলতে দেরী হ'ল না। কবিদের আগমন হ'তে লাগল একে একে। অবশ্য আগের দিনের মত হাসি-হাসি ভাব নয় কবিদের। একটা সঙ্কোচ, একটা ভয়ের ছাপ তাঁদের মুখে। নতুন কবিতা চাইছেন রাজা। জ্ঞানবুদ্ধিমত নতুন কবিতাই লিখেছেন এঁরা। জেনেশুনে চুরি কেউ করেন নি। কিন্তু "নতুন" বলতে রাজা কী বুঝলেন, তা কে জানে? ঢেঁটরাতে কোন ব্যাখ্যা ত ছিল না! নতুন ভাব হ'লেই নতুন কবিতা হবে ত? ভাষা আর নতুন পাওয়া যাবে কোথায়? মান্ধাতার আমলের সেই পুরোণো ভাষাই ত সবাইয়ের সম্বল! আর "ভাবের" কথাতেও আপত্তি তোলা যায়, যদি আপত্তি তোলার মতলব নিয়েই কেউ কবিতা শুনতে বসে!

"চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে"—এসব কথা ত লক্ষ কবি লক্ষ রকমে ব'লে গেছেন এর আগে। কাজেই যে-কবিতায় চাঁদ-ওঠা বা ফুল-ফোটার কথা আছে, তাকে ত পুরোণো ভাবের কবিতা ব'লে অনায়াসেই অগ্রাহ্য করা চলে! অথচ, চাঁদ আর ফুল বাদ দিয়ে কবিতাই বা হয় কেমন ক'রে?

যাই হ'ক, কবিরা আসতে সুরু করলেন।

প্রথম দিন, প্রথম কবিতা পড়া হ'ল।

রাজার মনে হ'ল—সুন্দর কবিতাটি! এক্ষেত্রে তার চেয়ে বড় কথা—রাজার মনে হ'ল—কবিতাটি নতুন। হাজার হাজার কবিতা তিনি শুনেছেন, পড়েছেন, লিখেছেনও। কিন্তু এ-নতুন কবিতা। রাজা শপথ ক'রে বলতে পারেন—এ-কবিতা নতুন।

কিন্তু চুক্তি ত ভঙ্গ করা যাবে না! রাজার একার মতে কাজ হবে না এখন। জিজ্ঞাসা করতে হবে এ-সভার সাতশো সভাসদকে, সেপাই সান্ত্রী পেয়াদা বরকন্দাজকে! জিজ্ঞাসা করতে হবে যে এ-কবিতাটি নতুন না পুরোণো।

রাজা মন্ত্রীর দিকে চাইলেন। মন্ত্রী হেঁকে বললেন—"মহারাজের আদেশ—আপনাদের ভিতর কেউ যদি এ-কবিতা শুনে থাকেন, সেকথা প্রকাশ ক'রে বলুন। যদি কেউ না শুনে থাকেন, তাহ'লে এই কবি লক্ষ মোহর পুরস্কার পাবেন।"

কেউ নড়ে না, কেউ টুঁ শব্দ করে না। কবির মন আশান্বিত হ'য়ে ওঠে, চোখের সামনে যেন দেখতে পায়—লক্ষ মোহরের একটা স্তূপ সূর্য্যালোকে ঝকমক করছে; তার দিকে চেয়ে থাকা যায় না—এত উজ্জ্বল!

হঠাৎ ও কী? একটি লোক উঠে দাঁড়িয়েছে! কেউ বড় চেনে না লোকটিকে। চেনে শুধু সভার দুই চারজন বিশিষ্ট লোক। যারা চেনে—তারাও বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এটাকে একটা অকর্ম্মণ্য কুপোষ্য ব'লেই ধারণা ক'রে ব'সে আছে সবাই। হঠাৎ আজ এই কবিতার বিচারে সে কী ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়?

লোকটি মহারাজকে অভিবাদন ক'রে বলল—"মহারাজ! কবিতাটি নতুন ব'লে কবির এই যে দাবি—এটা বোধ হয় স্বীকার ক'রে নেওয়া চলে না। কোথায় শুনেছি, কবে পড়েছি—ঠিক স্মরণ হচ্ছে না; কিন্তু কবিতাটি বহুদিন থেকেই আমার কণ্ঠস্থ আছে। মহারাজ শুনে বিচার করুন।"

অতঃপর শ্রুতিধর লোকটি সেই কবিতা অবিকল আবৃত্তি ক'রে গেল। কবির মাথায় যেন নির্ম্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাত হ'ল অকস্মাৎ!

কবি পুরস্কার পেলেন না। কে বেশী দুঃখ পেল তাতে? রাজা না কবি?—বলা শক্ত!

* * * * * *

দিন যায়। আরও আরও কবিরা আসেন। নিত্য নতুন কবিতা পড়েন রাজার সমুখে। কিন্তু তাঁদের পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই শ্রুতিধর নির্ভুল আবৃত্তি ক'রে যায় কবিতার। কবি আর পুরস্কার পান না।

রাজা নিত্য নতুন কবিতা শুনতে পান, অথচ তার জন্য এক কাণাকড়িও খরচ হয় না রাজকোষ থেকে। মন্ত্রী তৃপ্ত, কিন্তু রাজা বিষণ্ণ। তিনি এক একবার ভাবেন—এ-প্রহসনে যবনিকা ফেলে দেবেন পরদিন। কিন্তু এমনিই তাঁর শোনার নেশা, সময়কালে মন্ত্রীকে আর বলতে পারেন

না যে, "নতুন ঢেঁটরা দিয়ে দিন, আমি আর কবিতা শুনব না!"—প্রহসনের অভিনয় চলতেই থাকে, দিনের পর দিন।

এ-প্রহসনের গোপন রহস্য কিন্তু আর গোপন নেই। কবিতা শোনার নাম নিয়ে যে

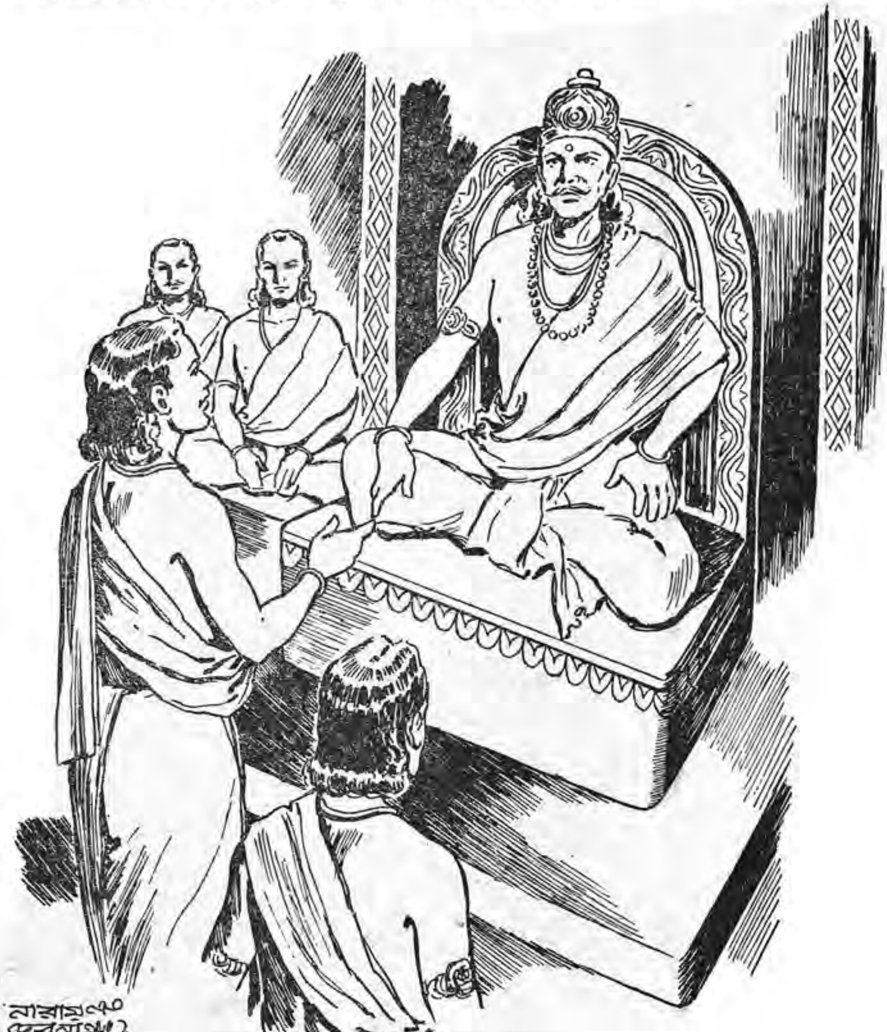

কবি উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করলেন তাঁর কবিতা। [পৃঃ ১১১

একটা নিষ্ঠুর প্রতারণা চলছে রাজসভায়—এটা কাণাঘুষা চলেছে সারা দেশে। দেশের এক নতুন কবি সঙ্কল্প করলেন এ নিষ্ঠুরতা বন্ধ করবার জন্য।

ভেবে ভেবে তিনি এক কবিতা লিখলেন।

কবিতা লিখে রাজসভায় এলেন তা শোনাবার জন্য।

রাজা বসেছেন, মন্ত্রী বসেছেন, বসেছে সাতশো সভাসদ। আর সেই সভাসদদের ভিতরই ব'সে আছে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে এক প্রতারক।

সেই শ্রুতিধর! বেতনের লোভে দিনের পর দিন সে কবিদের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে যাচ্ছে; ঈশ্বরদত্ত শক্তির করছে অপব্যবহার! সবাই চিনে ফেলেছে তাকে। দিয়েছে প্রকাশ্যে ধিক্কার! কিন্তু তবু সে মুখটি বুজে নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছে, অর্থটি তার চাই যে!

রাজার অনুমতি রাজার মুখ থেকে এলো না, এলো মন্ত্রীর মুখ থেকে। রাজা যতটা সম্ভব নিজেকে আলাদা রাখতে চান এ-ব্যাপার থেকে।

কবি উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করলেন তাঁর কবিতা; বজ্রের মত গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর! সে ত কবিতার চরণ নয়, বিধাতার দণ্ডাদেশ যেন! রাজা উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলেন। মন্ত্রী শিউরে উঠলেন! অবাক বিস্ময়ে সাতশো সভাসদ তাকিয়ে রইল কবির দিকে।

শ্রুতিধর কী বলবে? তার উভয় সঙ্কট! সে যদি বলে যে সে এ-কবিতা শুনেছে, রাজাকে এখনই লক্ষ মোহর গুণে দিতে হয় কবির হাতে! কারণ কবিতার মর্ম্ম হ'ল এই যে—রাজার স্বর্গতঃ পিতা লক্ষ মোহর ঋণ করেছিলেন কবির পিতার কাছে!

আর শ্রুতিধর যদি বলে যে, এ কবিতা সে শোনে নি, তা হ'লেও কবি নতুন কবিতা রচনার পুরস্কার পাবেন—ঐ লক্ষ মোহর!

শ্রুতিধরের উভয় সঙ্কট মোচন হ'ল মন্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধিতে তিনি উচ্চহাস্য ক'রে উঠে কবির কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর দু'টি হাত ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। হাসতে হাসতেই বললেন—"মহারাজ! আমার ভণ্ডামির সাজা ইনি দিয়েছেন। আমি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই কৌশল করেছিলাম। কিন্তু ইনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন—আমার চাইতেও কৌশলী লোক এদেশে আছেন। দিন এঁকে লক্ষ মোহর! আর এরপর কবিতার বিচার মহারাজ নিজেই করবেন এই নবীন কবিকে নিয়ে। শ্রুতিধরকে আমি অন্য কাজ দেব।"

এই নবীন কবি—কে ইনি, জানো? ইনি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি—কালিদাস!

● **মণিমুক্তা—**

মানুষ যখন কোনও অন্যায় বা পাপের পথে এগিয়ে চলে, তখন সে ভাবে যে, তার মত বুদ্ধিমান লোক জগতে বোধ হয় আর কেউ নেই। তার অপরাধ কোনও দিনই ধরা পড়বে না। কিন্তু পৃথিবীতে প্রত্যেকটি অপরাধেই অপরাধী কিছু না কিছু প্রমাণ পেছনে রেখে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান অপরাধীর পাপও তাই চিরদিন চাপা থাকে না।

—স্যর আর্থার কন্যান ডয়েল

নতুন দৃষ্টি

—কুমারী পুষ্পা চট্টোপাধ্যায়

আজ আবার ইতিহাস বইটা হারিয়ে গেছে।—

স্কুলে লেখাপড়ার বিষয়ে বলতে গেলে বেশ দুর্নাম আছে আমার; অন্য বিষয়েও অবিশ্যি তেমন কিছু সুনাম নেই! স্কুলে যাই বাবার বকুনির ভয়ে, আর দু'বেলা বই নিয়ে বসি তো নামমাত্র; তাও কয়েকদিন ধ'রে এক নতুন উপদ্রব সুরু হয়েছে। পড়তে ব'সে হয়তো দেখি একটা না একটা বই নেই; আবার তার পরদিন বা দু'একদিন পরে হয়তো যথাস্থানেই পাই সেটাকে। বাড়ীতে তেমন কোন দুষ্টু ছেলেমেয়েও নেই, থাকবার ভেতর শুধু আমি, বাবা, মা আর বার-তের বছরের শান্তশিষ্ট বাস্তুহারা নতুন চাকর টুলু।

খুঁজে খুঁজে বইটা কোথাও পাচ্ছি না—এমন সময় টুলু ঘরে ঢুকে বইটা টেবিলের উপর রাখল, তারপর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বলল, "একটু পড়তে নিয়েছিলাম।—"

রাগে ফেটে পড়লাম; ঠাস্ ক'রে তার গালে একটা চড় মেরে বললাম, "পড়তে নিয়েছিলাম, অসভ্য ছেলে কোথাকার, না ব'লে খবরদার আমার পড়ার টেবিলে হাত দেবে না। যাও—"

মুখ নীচু ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টুলু।

সেদিন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা।

কি যেন একটা চাপা একটানা গুন গুন শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। টুলু আমার পাশের ছোট ঘরটায় শোয়। কান পেতে শুনলাম, মনে হ'ল শব্দটা ওখান থেকেই আসছে। একটু কৌতূহল হ'ল, তাইত এত রাত্রে কি করছে টুলু?

খাট থেকে নেমে পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এলাম। টুলুর ঘরের জানালাটা খোলা; সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখলাম—ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বলছে, আর তারই ক্ষীণ আলোকে আমার ফেলে দেওয়া ছেঁড়া গ্রামার বইটা সে এক মনে প'ড়ে চলেছে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় একাগ্রতা। ঘুমে ঢুলু ঢুলু দু'টি চোখে ভেসে উঠেছে এক অজানা সুদূরের স্বপ্ন!

চুপি চুপি পালিয়ে এলাম।

টুলু আমার জীবনের পথে এনে দিল নতুন আলো। চোখে এনে দিল নতুন দৃষ্টি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে ভাবেই হোক লেখাপড়া শিখে বড় হব, কোন

গ্রামে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করব এক স্কুল, সেখানে আমার প্রতিদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রমে মানুষের মত মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠবে এক-একটি অনাথ, বাস্তুহারা, দরিদ্র, অসহায় ছেলেমেয়ে। এই পৃথিবীতে খুঁজে নিতে পারবে তারা মাথা উঁচু ক'রে বাঁচবার আশ্রয়।

পরদিন সকালে পড়ার টেবিলে ব'সে ডাকলাম, "টুলু—"

টুলু নতমস্তকে অপরাধীর মত সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে আমার একটা নতুন কেনা ইংরেজী গ্রামার বই দিয়ে বললাম—"নে, এটা তোকে দিলাম। তোর যা বই দরকার হবে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিবি। বাবাকে ব'লে সামনের বছরেই তোকে স্কুলে ভর্ত্তি করবার ব্যবস্থা করব, বুঝলি ?"

টুলু একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, বড় বড় জলে ভরা টলটলে দু'টি চোখে এসে জমা হ'ল যেন রাজ্যের কৃতজ্ঞতা। ধীরে ধীরে মুখটা নীচু করল, তারপর চকিতে আমার পায়ে একটা প্রণাম ক'রে বইটা বুকে চেপে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

● জেনে রাখা ভাল

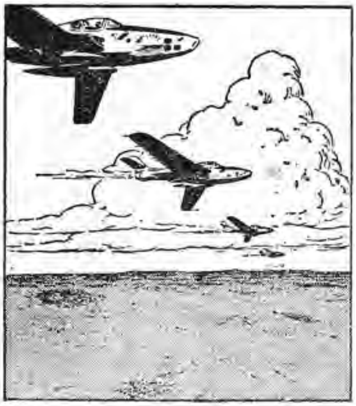

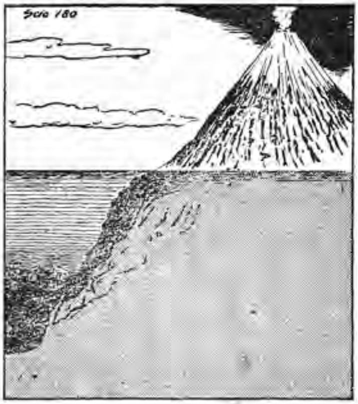

১নং চিত্র। আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ ঠিক মত করা হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করবার জন্যে যদি চারটি জেট্-এরোপ্লেন একসঙ্গে ইটালীর মত দেশের ফটোগ্রাফ তোলে তাহলে এক ঘণ্টায় সারা ইটালীর ছবি উঠে যাবে।

২নং চিত্র। ইচ্ছামত রং বদলাতে পারে বলে প্রাণীটির নাম বহুরূপী। রেগে গেলে প্রাণীটির বর্ণ হয় ছাই রঙের। যুদ্ধ জয়ের পর তার বর্ণ হয় টাট্‌কা সবুজ। পরাজিত প্রাণীটির রং হয় হাল্‌কা হলুদ।

৩নং চিত্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এভারেষ্ট পর্ব্বত সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। এর উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। কিন্তু মেপে দেখা গেছে হাওয়াই দ্বীপের মনা ক্রিয়া পর্ব্বতের উচ্চতা ৩০,৭৮৫ ফুট। দুঃখের বিষয় এর বেশীর ভাগই অর্থাৎ ১৭.০০০ ফুট রয়েছে জলের নীচে।

গল্প বলো

—শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ

বাইরে তখনো অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। মিণ্টু, নণ্টু, ঝণ্টু, সণ্টু সকলেই আজ বাড়ীতে—কেউ খেলতে বেরোয় নি। এই বৃষ্টিতে কক্ষণো ঘরের বার হ'তে আছে! বৈঠকখানায় তাই সব গুলজার হচ্ছে।

মিণ্টু আবৃত্তি সুরু করে :

'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওগো আজ তোরা
যাসনে ঘরের বাহিরে'···

হঠাৎ ভিজতে ভিজতে দা-ঠাকুরের আবির্ভাব। সকলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, 'দা-ঠাকুর, দা-ঠাকুর এসেছে রে···গল্প বলো দা-ঠাকুর!'

দা-ঠাকুরকে তোমরা চেন? ওঃ, চেন না! তবে পরিচয়টা একটু খুলেই বলা যাক। দা-ঠাকুর হচ্ছেন পাড়ার সব ছোটদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, গল্প বলার সাথী। সকলেই এই মজাদার মানুষটিকে পেলে আর কিছু চায় না,—এমনকি, বাবা কাকা বা দাদাদের পর্য্যন্ত 'ডোণ্ট-কেয়ার' করে। হ্যাঁ, দা-ঠাকুরেরও বিশেষ কেউ তেমন নেই। প্রায় বছর দশেক আগে পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সংসারধর্ম্ম উঠেছে; মানে সোজা কথায় তিনি সংসার-বিবাগী হয়েছেন। বয়স ষাটের কোঠায় হ'লেও মনে কিন্তু তিনি চিরতরুণ, কাঁচা—একেবারে কিশোর বল্লেও চলে। তিনি হচ্ছেন

সব্বার সরকারী দা-ঠাকুর। মিলিটারীতে এককালে কাজ করতেন তিনি, তাঁর জীবনের সেইসব রোমান্স, অ্যাড্‌ভেঞ্চার বলতে থাকেন ছেলেদের। আর কাকেই বা শোনাবেন—ছেলেরাই ত বলতে গেলে তাঁর একান্ত প্রিয়জন।

'দা-ঠাকুর, ভিজে গেছো একেবারে'—দুঃখ ক'রে বললে মিণ্টু।

'কী করবো বল্—যে বৃষ্টি, তোদের এ-পর্য্যন্ত আসতেই'......

ঝণ্টু তাড়াতাড়ি গামছা, একখানা শুকনো কাপড় ও জামা এনে দেয় দা-ঠাকুরকে। নণ্টু এক কাপ গরম চা এনে দেয় সেই সঙ্গে। বৃষ্টিতে ভেজবার পর গরম চা যে দা-ঠাকুরের মনকে নরম করবে, নণ্টু তা জানে। আর নরম করতে পারলেই ত দা-ঠাকুরের গল্প শোনা যাবে।

এরপর ঝণ্টু ব'লে ওঠে—'একটা গল্প বলনা দা-ঠাকুর। আজকের দিনে গল্প কিন্তু ভারী জমবে।'

'কি গল্প শুনবি রে, পাগলা'—দা-ঠাকুর হেসে বলেন।

'পরীর, ভূতের, ডিটেকটিভের......'—সমস্বরে বলে ওঠে নণ্টু ঝণ্টু—সণ্টুরা।

ভাবতে থাকেন দা-ঠাকুর,—'না-রে ও সব কিছু নয় আজকে। ওসব আষাঢ়ে গল্প তোরা ঢের শুনেছিস। আজ বলবো বেদ-পুরাণের সব চমৎকার চমৎকার গল্প। শোন তবে ব্রহ্মপুরাণ থেকে একটা গল্প বলি।'

দা-ঠাকুরকে মাঝে রেখে সব ঘিরে বসে গল্প শোনার আগ্রহে। চশমাটাকে নাকের ডগায় বেশ ক'রে এঁটে নিয়ে দা-ঠাকুর সুরু করেন তাঁর গল্প।

তোমরাও দা-ঠাকুরের গল্প শুনে নাও, কি বলো?—

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। সেকালের পুরাণো এক কাহিনী। তখন রেল, ষ্টিমার এ-সব যান-বাহনের কিছুরই আবিষ্কার হয়নি। সেই মুনি-ঋষিদের যুগের কথা। সে সময় ভৌবন বলে এক খুব বড় রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যে বাস করতো এক গরীব ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ছেলের নাম ছিল গৌতম। নানা শাস্ত্রে ও বিদ্যায় পারদর্শী হ'লেও স্বভাব তার ছিল খুবই খারাপ। তার বন্ধু মণিকুণ্ডলের ছিল প্রচুর ধনসম্পদ। ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে সে এত বড় হয়েছে। ধনী হ'লেও তার মন ছিল উদার, সরল, সাদাসিধে ও ধার্ম্মিক। গৌতম মণিকুণ্ডলের সৌভাগ্যে খুব হিংসে করতো।

মনে মনে ফন্দী আঁটতো কি ক'রে সে মণিকুণ্ডলকে ফাঁকি দিয়ে তার সব ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে। এই ভেবে সে মণিকুণ্ডলকে বললে, 'চল ভাই আমরা দূরদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করি।'

তার বন্ধু এতে রাজি হ'তে চাইলে না। তার ত' টাকার অভাব নেই, পৈতৃক সম্পত্তি, বিষয়-আশয় যা পেয়েছে তাইই যথেষ্ট। তবু গৌতমের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সম্মতি না দিয়ে সে পারলে না। বেরিয়ে পড়লো তারা দু'জনে বিদেশে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে পড়লো এক সহর অঞ্চলে। সেখানে এক গরীব কাঠুরের বাড়ীতে আশ্রয় নিল দু'জনে।

কিছুদিন যায়। কথাপ্রসঙ্গে গৌতম বন্ধুকে বললে, 'ভাই পৃথিবীতে দেখ, ধার্ম্মিক

লোকেরাই বেশী কষ্ট ভোগ করে। আজকাল ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'রে কোন লাভ নেই। লোকে ওর কোন মর্য্যাদাই দেয় না। যে দিন-কাল পড়েছে তাতে অধর্ম্ম আর পাপেরই জয়। মিছামিছি সৎপথ ধ'রে আঁকড়ে থাকা বোকামি—অনর্থক খালি কষ্টই সার হয়।'

মণিকুণ্ডল গৌতমের কথায় শিউরে উঠে বলে, 'ছিঃ ভাই, অমন কথা কক্ষণো মুখে আনতে নেই। যেখানে পাপ, ব্যভিচার সেখানেই ক্লেশ, দুঃখ, অধঃপতন। ধর্ম্মপথেই যথার্থ সুখ, ও পথ থেকে বিচ্যুত হ'তে নেই।'

দু'জনের দুই বিপরীত মত নিয়ে ওঠে বিপুল তর্ক, দ্বন্দ্ব, হাতাহাতি প্রায়। যাহোক শেষ পর্য্যন্ত বাজী রাখা হয় যে, গৌতম প্রত্যেক লোককে জিজ্ঞেস করবে তাতে যদি সবাই তার কথায় সায় দেয় তাহ'লে সে মণিকুণ্ডলের সর্ব্বস্ব ধন-সম্পত্তি লাভ করবে ; আর যদি না হয়, তবে সে তার যথাসর্ব্বস্ব মণিকুণ্ডলকে দান করবে।

প্রতিবেশী সব লোককে জিজ্ঞেস ক'রে গৌতম গেল জিতে। সকলে একবাক্যে বললে, 'আজকাল অধর্ম্মেরই যুগ, তারই জয় সর্ব্বত্র।'

মণিকুণ্ডল হেরে গেলেও সে ক্ষুণ্ণ হল না বা লক্ষ্যপথও ছাড়লো না। ঠগ, দুষ্টু লোকের দ্বারা প্রতারিত হ'লেও সে পূর্ব্বের মতই ধর্ম্মের গুণগান করতে লাগলো।

গৌতমের লালসার তৃপ্তি হ'ল না এতে। বন্ধুর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েও সে তাকে আরো জব্দ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। মণিকুণ্ডলকে বললে, 'দেখলে ত' ভাই, সবাই এখন অধর্ম্মের দিকে চলেছে ; তুমি একা কেন অযথা দুঃখ পাও। ধর্ম্মের গুণগান ছাড়।'

মণিকুণ্ডল কিন্তু কিছুতেই তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। আবার বাজী ফেলা হ'ল। এবারেও মণিকুণ্ডল হেরে গেল। গৌতম তার দু'খানা হাত কেটে দিলে। তবু সে হ'ল না আদর্শচ্যুত। পাপিষ্ঠ, দুরাত্মা গৌতমকে ভগবানের মহিমা শোনাতে লাগলো। 'সৎপথে থাকলে তাঁর দয়া লাভ করা যায়' ইত্যাদি।

এমনিভাবে পরিব্রাজকের মত ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে উপস্থিত হ'ল এক গ্রামে। গঙ্গার তীরে এক মন্দিরের সামনে যখন পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গঙ্গাস্নান ক'রে তারা ফলমূল কিছু খেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। তর্ক উঠলো ধর্ম্ম-অধর্ম্মের মধ্যে বড় কে ? গৌতম এবার তার কপট দুরভিসন্ধির শেষ করলে মণিকুণ্ডলের দু'টি চোখ অন্ধ ক'রে দিয়ে।

মণিকুণ্ডল মন্দিরের প্রাঙ্গণে প'ড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। তবু সে ভগবানকে বিশ্বাস ক'রে তাঁকে ডাকতে লাগলো, 'হে প্রভু, আজ তোমার জন্যেই আমার এ শাস্তি, তুমি দয়া কর। যারা ভুল করেছে, তাদের তুমি ক্ষমা করো। এতদিন চোখ ছিল, তোমাকে দেখতে পাইনি, আজ অন্ধ হ'য়ে যেন তোমাকেই আশ্রয় ক'রে থাকতে পারি, তোমাকেই একমনে ডাকতে পারি।'

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সেদিন ছিল শুক্লা একাদশী। রাক্ষসরাজ বিভীষণ সেই মন্দিরের পূজা শেষ ক'রে ফেরবার সময় বণিক মণিকুণ্ডলকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখে এগিয়ে গেলেন বণিকের কাছে। সব কথা শুনে খুব দুঃখিত হলেন রাজা। ছেলেকে আদেশ করলেন মন্দিরের কাছেই যে 'মৃতসঞ্জীবনী' ও 'বিশল্যকরণী'র গাছ আছে, তার কয়েকটা

পাতা ছিঁড়ে আনবার জন্যে। যে 'মৃতসঞ্জীবনী' আর 'বিশল্যকরণী' দিয়ে হনুমান লক্ষ্মণকে শক্তিশেলের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, সেই গাছের কয়েকটি চারা এখানে ছিল তা রাজাজানতেন।

সেই গাছের স্পর্শে মণিকুণ্ডল সুস্থ হ'য়ে উঠলো। পূর্ব্বেকার মত সে তার সবল স্বাস্থ্য ও চোখ সব কিছুই ফিরে পেল। রাজাকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে আবার সুরু করলে পথচলা।

কিছুদিন এদেশ সেদেশ ক'রে ঘুরতে ঘুরতে এক রাজার রাজ্যে এসে শুনলে, সেখানকার রাজার মনে শান্তি নেই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কিন্তু তাঁর একমাত্র মেয়ে অন্ধ। মেয়ের রূপের তুলনা হয় না। ঐ একটি মাত্র দোষের জন্যে তার বিয়ে হয় না। তাই এই খুঁতের জন্যে রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে-কেউ, সে রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্য, দানব, মানব, দেবতা যেই হোক না কেন, তাঁর মেয়ের অন্ধতা ঘুচাতে পারবে তার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। এ প্রতিজ্ঞাও বড় কম নয়। কিন্তু কেউই তা পারে না।

মণিকুণ্ডল একথা শুনে গেল তখনই রাজার কাছে। গুণযুক্ত 'মৃতসঞ্জীবনী' ও 'বিশল্যকরণী' গাছের স্পর্শে রাজকন্যার চোখ ভাল হ'য়ে গেল। রাজার আনন্দের সীমা থাকে না। খুব ঘটা ক'রে তখন রাজকন্যার সাথে মণিকুণ্ডলের বিয়ে হ'য়ে গেল।

অগাধ ধন-দৌলতের মালিক হ'ল এখন সেই বণিক মণিকুণ্ডল। পরম সৌভাগ্যশালী হ'য়ে তার দিন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটতে লাগলো। কিন্তু সে তার বন্ধু গৌতমের কথা এত আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যের মাঝেও ভুলতে পারলো না। দেশ-দেশান্তরে খোঁজ-খবরের জন্য লোক পাঠালো, কিন্তু কেউ তার খোঁজ দিতে পারলো না। আর পারবেই বা কেমন ক'রে বলো, এখন যা তার অবস্থা।

কথায় বলে পাপের ধন যায় প্রায়শ্চিত্তে। গৌতমের হ'ল ঠিক তাই। জুয়া খেলায় আর অসৎসঙ্গে ফাঁকির সব অর্থ যায় ব্যয় হ'য়ে। বন্ধুকে ঠকিয়ে সে মস্ত বড়লোক হয়েছিল বটে, কিন্তু পাপের আগুনে পুড়ে তা ছাই হ'য়ে গেল। দু'বেলা এখন সে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য করে আফসোস। নিজের পাপে নিজেই সে ধ্বংস হচ্ছে। দোষ কার! অনাহারে, অর্দ্ধাহারে শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে তার, দুশ্চিন্তায় পাগলের মত হ'য়ে উঠেছে তার মন। সে গৌতম এখন আর নেই। ভিক্ষে করে। কোন বেলা জোটে, হয়ত কোন বেলা সে গুড়েও বালি। কী তার অবস্থা চিন্তা করলে গা-কেঁপে ওঠে। মানুষের কখন কি হয় তা কে বলতে পারে?

ভিক্ষে করতে করতে সে মণিকুণ্ডলের রাজ্যে এসে উপস্থিত!

হ্যাঁ, ভালকথা বলতে ভুলে গেছি, মণিকুণ্ডলই এখন দেশের রাজা। রাজা তাঁর জামাইয়ের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন। দান-ধ্যানে, দয়া-দাক্ষিণ্যে মণিকুণ্ডলের সুনাম-প্রতিপত্তি দূরদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সকলে তার পুণ্যনাম ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করে। ফকির, দরবেশ থেকে সুরু ক'রে সব প্রজারা তার গুণগানে ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে। সে এখন রাজর্ষি মণিকুণ্ডল।

গৌতম শুনলে যে আজ রাজার ছেলের জন্মদিন। তাই রাজবাড়ীতে আজ প্রচুর দান-ধ্যান হবে—বিরাট উৎসব সেখানে। গৌতম ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে মলিন বদনে শীর্ণ দেহে রাজার বাড়ীতে ঠিক সময়ে হাজির হ'ল।

রাণীমা স্বহস্তে দান করছেন। রাজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই জনতার আশিস কুড়োচ্ছেন। কী বিনীত সহাস্য মুখ—যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সবাই দু'হাত তুলে প্রাণভরে আশিস জানাচ্ছে। 'জয় হোক, মহারাজার,—দীর্ঘজীবী হোন রাজকুমার।'—ফুলের মত ঝ'রে পড়ছে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত শুভকামনা।

রাণীমার হাত থেকে স্বর্ণ-মুদ্রা ও কাপড় নেওয়ার সময় গৌতম চমকে উঠল। অবাক হ'য়ে সে তাকিয়ে দেখছে রাণীমার দিকে,—এ কি দেবী না মানবী! এত সুষমা, এমন নিখুঁত গড়ন ত মানুষের হয় না; সত্যই মা লক্ষ্মী স্বয়ং আজ তার সামনে। কি যেন ভাবলে,—তারপর তার মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রে শীর্ণ হাত দু'খানি জোড় ক'রে প্রণাম জানালে সে। প্রণামে যেন তার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেল। কর্ম্মগুণে মানুষই হয় দেবপদবাচ্য—কিংবা নরকের কীট। আজ গৌতম মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলে তা'—তার সামনে ভেসে উঠলো এক আলোর জগৎ, যেখানে পুণ্যের সুরধুনী তান তুলেছে অগণিত হিল্লোলে, ধর্ম্মের ও ন্যায়ের বিজয় কেতন উড়ছে সগৌরবে। পাপের সব আঁধার নিমেষে কেটে যায় ধর্ম্মের রশ্মিতে। ধর্ম্মেরই চিরজয়,—ধর্ম্মই মহান্ অনন্ত শাশ্বত শক্তি। তার রূপে জৌলুস নেই—আছে প্রশান্তি, কমনীয়তা, মাদকতা-শূন্য এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুষমা, শোভা।

হঠাৎ রাজার নজরে পড়লো গৌতম। প্রথমে গৌতমকে রাজা ঠিক চিনতে পারেন নি। আর না পারা স্বাভাবিক, কারণ, দীর্ঘ এত বছরের পরে এমনি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনও রাজা আশা করেন নি।

জঞ্জালের মধ্যে, অর্থাৎ কি না মলিন জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার ভিতর থেকে তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু গৌতমকে আবিষ্কার করলেন। হ্যাঁ, আবিষ্কারই ত'। অন্য কেউ হ'লে কি চিনতেই পারতো, না পরিচয়ই দিত? কিন্তু মণিকুণ্ডল সত্যিকারের সৎ, আদর্শবাদী, পরম ধার্ম্মিক লোক, তাই পুরণো বন্ধুকে এতকাল পরে ফিরে পেয়ে খুব খুসীই হ'ল।

লজ্জায় গৌতম নত হ'য়ে আসে। তার ও-মুখ দেখাতে সে ভরসা পায় না। দু'পা জড়িয়ে ধ'রে রাজার······রাজা ক্ষমাশীল, গৌতমকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। তার পরিবর্ত্তন দেখে মনে মনে ভারী খুসী হলেন তিনি। পরম সমাদরে রাজবাড়ীতে ঠাঁই দিলেন তাকে।

তাকে তাঁর সভাসদ করলেন। আর পাঁচজন জ্ঞানী, গুণী পণ্ডিতদের মাঝে তারও একটা আসন হ'ল। নানা শাস্ত্র-আলোচনার মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে কথা উঠলে এখন (গৌতম) দর্পভরে এগিয়ে যায়, জোর দিয়ে বলে, 'ধর্ম্মেরই জয়,—চিরদিনই হবে তার জয়।'

দা-ঠাকুরের গল্প শেষ হ'লো।

এদিকে বাইরে তখন দমকা হাওয়ায় বৃষ্টি আবার জোরে এল।

———

* কুলদারঞ্জন রায়ের 'গৌতম ও মণিকুণ্ডল' গল্পটির ছায়া অবলম্বনে।

খোকা-খুকু ঘুমালো

—শ্রীদীপক কুমার দত্ত

গল্পের রাজ-ঘোড়া
বহু দূরে পালালো ;—
নিঃঝুম চারিদিক,
খোকা-খুকু ঘুমালো।

সব খোকা ঘুমালো—
চেঁচামেচি বন্ধ,
সব খুকু ঘুমালো—
পাড়া নিস্পন্দ।

নিঃঝুম রাত্রিতে
বায়ু বয় ঝির ঝির—
খোকা-খুকু ঘুমালো,
বন করে শির শির,

ঘুম-ঘুম সব চোখ—
সব দেহ ক্লান্ত,
খোকা-খুকু ঘুমালো—
বাড়ী হলো শান্ত।

নিঃঝুম রাত্রিতে
শিশিরের টুপটাপ,
খোকা-খুকু ঘুমালো,
পশু-পাখী চুপ্‌চাপ্‌,

আকাশের তারাগুলো
কি ধ্যানে যে মগ্ন,
খোকা-খুকু ঘুমালো—
দেখে রাঙা স্বপ্ন।

নিঃঝুম রাত্রিতে
সব জ্বালা পালালো,
ফুটছে যে কত ফুল,
খোকা-খুকু ঘুমালো—

রাঙা কাঁথা গায়ে দিয়ে
খোকা-খুকু ঘুমালো,
আঁধারের শান্তিতে
খোকা-খুকু ঘুমালো।

● **জেনে রাখা ভাল**

১ নং চিত্র। ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছিল। তারপরে আজ অবধি সবশুদ্ধ ৩৩ জন লোক জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হ'য়ে প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন।

২ নং চিত্র। পশ্চিম আফ্রিকায় "পটো" নামে এক জানোয়ার আছে। স্তন্যপায়ী পশুদের মধ্যে এ এক অদ্ভুত প্রাণী। এর পিঠের মেরুদণ্ড ঘাড় থেকে বাইরে বর্শার মত ফুটে বেরিয়ে থাকে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় "পটো" এই মেরুদণ্ড অস্ত্রের মত ব্যবহার করে।

৩ নং চিত্র। কানাডার বন-হংসীরা ইংরাজী V এই আকারে আকাশে উড়ে যায়। এইভাবে উড়ে গেলে বায়ুর চাপে সারা দলটির কোন বেগ পেতে হয় না।

সোনালী পাখী

[রূপকথা]

—মুরারিমোহন বিটু

সারা সুবর্ণগড় রাজ্যে গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রজারা সকলে এ ওর মুখের দিকে চাইছে, আর চুপিচুপি বলাবলি করছে,—সোনালী রঙের কাকাতুয়া হয় কখনো? কাকাতুয়া সাদা হয়, এই তো আমরা জানি! রাজার এটা খামখেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়!

ব্যাপার ঘটেছে এইরকম: রাজা আজ ঢাক পিটিয়ে সারা রাজ্যময় ঘোষণা করে দিয়েছেন, যে-ব্যক্তি তাঁর মেয়ের জন্যে ডাইনীদের দেশ থেকে সোনালী রঙের কাকাতুয়া এনে দিতে পারবে, তার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন, আর উপহারস্বরূপ দেবেন অর্দ্ধেক রাজ্য! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যে কোন জাতির যে কোন ব্যক্তিকে সোনালী কাকাতুয়া এনে রাজকন্যাকে বিয়ে করবার অধিকার দেওয়া হল।

একদিন দুদিন করে একটা মাস কেটে গেল। কিন্তু সোনালী কাকাতুয়া নিয়ে কেউ রাজ-দরবারে এলো না। এই একমাস ধরে অবিরাম কেঁদে চলেছে রাজকন্যা। ঘরের নালা দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে গিয়ে বাড়ির পিছনে মস্তবড় এক সরোবর হয়ে গেল। সেই সরোবরে এখন থরে থরে পদ্মফুল ফোটে! এত জলও থাকে মানুষের চোখে? রাজা-রাণী, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন কত চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাজকন্যার চোখের জল বন্ধ হয় নি! সোনালী কাকাতুয়া না পেলে তার কান্না থামবে না! রাজা-রাণীর মনে তাই সুখ নেই এক রত্তি! গম্ভীরমুখে রাজা সিংহাসনে এসে বসেন, আবার উঠে যান……কোন কথা বলেন না। পাত্র-মিত্র সভাসদেরা মাথা নীচু করে বসে থাকেন যে যার জায়গায়।

প্রথম যেদিন রাজকন্যার চোখে জল দেখা দিয়েছিল, সেদিন রাজবাড়িতে সে কি হুলস্থুল ব্যাপার। রাজা এসে জিজ্ঞেস করেন,—কি হয়েছে মা?

রাণী জিজ্ঞেস করেন,—কি হয়েছে মা?

দাস-দাসীরা জিজ্ঞেস করে,—কি হয়েছে দিদিমণি?

রাজকন্যা বলে,—সোনালী রঙের কাকাতুয়া চাই!

যেন আকাশ ভেঙে পড়ে সবার মাথায়! এ আবার কি অসম্ভব আব্দার? রাজা বলেন,—সোনালী রঙের কাকাতুয়া হয় কখনো?

রাণী বললেন,—সোনালী কাকাতুয়া হয় কখনো?

দাস-দাসীরা বললো,—সোনালী রঙের কাকাতুয়া হয় না দিদিমণি……কাকাতুয়া হয় সাদা রঙের!

রাজকন্যা কারুর কথাতেই কান দিল না। ঠোঁট ফুলিয়ে বললো,—হয়, হয়, হয়!

রাজা কাছে এগিয়ে গিয়ে মেয়েকে আদর করে বললেন,—তুমি কি সোনালী কাকাতুয়া দেখেছো কোথাও ?

—একশোবার দেখেছি! হাজারবার দেখেছি! এই দেখো!

রাণী জিজ্ঞেস করেন,—কি হয়েছে মা? [পৃঃ ১২১

রাজকন্যা একখানা ছবির বই খুলে দেখালো রাজাকে। রাজা দেখলেন, একটা সোনালী রঙের কাকাতুয়ার ছবি! বললেন,—এটা তো ছবি! শিল্পী ভুল করে সাদা রঙের বদলে সোনালী রঙ লাগিয়েছে কাকাতুয়ার গায়ে!

তবু রাজকন্যার গোঁ ভাঙে না। সোনালী কাকাতুয়াই তার চাই! বলে,—শিল্পী কচি খোকা নাকি, যে সাদা-সোনালীতে তার জ্ঞান নেই ?

অতঃপর রাজা নিরুপায় হয়ে দেশে দেশে চর পাঠালেন, যেমন করেই হোক সাতদিনের মধ্যে ঐ শিল্পীকে রাজপ্রাসাদে হাজির করা চাই! নচেৎ প্রত্যেকের গর্দ্দান যাবে!

চারদিনের দিন তারা শিল্পীকে রাজ-দরবারে হাজির করলো। শিল্পীর মুখ তো শুকিয়ে আমসির মত হয়ে গেছে! রাজা তাকে কাকাতুয়ার ছবিটি দেখিয়ে বললেন,—এটা কি তোমার আঁকা ছবি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ!

রাজা এবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন,—তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই শিল্পী, কাকাতুয়ার গায়ে সোনালী রঙ্ দিয়েছো কেন? জানো, এই সোনালী রঙের কাকাতুয়ার জন্যে আমার সংসারে কী ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে ?

—জানি মহারাজ!

—শুনেছো তাহলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখন আমি কৈফিয়ৎ চাই শিল্পী, কাকাতুয়ার গায়ে কেন তুমি সোনালী রঙ লাগিয়েছো? কেন তুমি এ মারাত্মক ভুল করেছো ?

শিল্পী স্থিরকণ্ঠে বলে,—না মহারাজ, ভুল আমি করি নি!

—ভুল করোনি ? অর্থাৎ বলতে চাও সোনালী রঙের কাকাতুয়া আছে ?

শিল্পী সবিনয়ে বলে,—মিথ্যা কথা বলবো না মহারাজ…স্বচক্ষে দেখিনি…গুরুদেবের মুখে শুনেছিলাম, সোনালী রঙের কাকাতুয়া আছে।

রাজা চঞ্চল হয়ে বললেন,—কোথায় থাকেন তোমার গুরুদেব ?

শিল্পী অদৃশ্য গুরুদেবের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে বললো,—তিনি মারা গেছেন বহুদিন হল। তাঁর মুখে সোনালী কাকাতুয়া সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, সে কথা বলছি শুনুন। এখান থেকে হাজার হাজার ক্রোশ তফাতে সাত সমুদ্দুর-তেরো নদীর ওপারে ডাইনীদের এক দেশ আছে। সেই দেশের এক পাহাড়ের চুড়োয় নাকি ঐ সোনালী রঙের কাকাতুয়া বসে থাকে। যুগ যুগ ধরে নাকি পাখীটা ঠিক একই জায়গায় বসে আছে।…এই পর্য্যন্ত জানি ; এর বেশি গুরুদেব আমাকে বলেন নি।

রাজা সব শুনে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,—গুরুদেব তোমাকে মিথ্যা কথা বলেন নি, এ বিশ্বাস তোমার আছে ?

—আছে মহারাজ! নইলে একটা অসম্ভব কল্পনাকে রূপ দিয়ে আমি দর্শকদের কাছে হাস্যাস্পদ হতে যাব কেন ? গুরুদেবের মুখ থেকে যা শুনেছি, ঠিক তেমনিই রূপ দিয়েছি ছবিতে। দেখছেন না, পাখীটা পাহাড়ের চুড়োয় বসে রয়েছে ?

রাজা বললেন,—বেশ, আমি আমার সভার পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করে দেখি। যতদিন না তাঁদের গবেষণায় তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে, ততদিন তোমাকে কারাগারে আটক রাখা হবে !

তারপর সেকি ভীষণ ব্যাপার ! রাজার আদেশে সভার পাঁচহাজার পণ্ডিত পাঁচ লক্ষ পুঁথি নিয়ে বসে গেলেন গবেষণায়। একদিন একরাত, দুদিন দু'রাত এমনি করে দশদিন দশরাত গবেষণার পর সোনালী কাকাতুয়ার সন্ধান পেলেন তাঁরা। শিল্পী যা বলেছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। রাজা তৎক্ষণাৎ শিল্পীকে মুক্তি দিলেন, এবং রাজ্যময় ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, যে ব্যক্তি সোনালী কাকাতুয়া এনে দিতে পারবে, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন…ইত্যাদি ইত্যাদি।

*　　*　　*　　*

এই রাজ্যের কোন এক গাঁয়ে বাস করত এক গরীব চাষার ছেলে। সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারত সে। সারা সুবর্ণগড় রাজ্যে বাঁশিতে তার জোড়া কেউ ছিল না। সে যখন গরু চরাতে গিয়ে মাঠের ধারে বসে করুণ সুরে বাঁশি বাজাত, পথচারীরা তখন কেঁদে বুক ভাসাত। পশু-পক্ষীর চোখ দিয়েও জল ঝরতো টপ্ টপ্ করে। গরুর দল ঘাস খেতে ভুলে যেত…অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো চাষার ছেলের দিকে।

রাজ্যের অন্যান্য সকলের মত ঐ চাষার ছেলেও শুনেছিল সোনালী কাকাতুয়া আর ডাইনীদের দেশের কথা। আরও শুনেছে যে, একমাস কেটে গেছে, তবু সোনালী কাকাতুয়া কেউ এনে দিতে পারে নি।

রাজকন্যাকে বিয়ে করবার লোভ তার নেই ; অর্দ্ধেক রাজ্যলাভের অসম্ভব কল্পনাও সে করে না। কিন্তু সাত সমুদ্দুর-তেরো নদীর ওপারের অজানা ডাইনীদের দেশ আর সোনালী কাকাতুয়ার আকর্ষণ তার কাছে ক্রমশঃ দুর্ব্বার হয়ে উঠলো।

সংসারে তার আপনার বলতে কেউ নেই। ছোট একটা কুঁড়ে ঘর, আর খানিকটা জমি। জমিতে চাষ করে, গরু চরায়, খায়-দায় আর মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়। তবুও জীবনটা ওর কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। নিজের গণ্ডীটুকু ছাড়া সে পৃথিবীর আর কিছুই চেনে না। আজ তার মনে হঠাৎ উত্তেজনা জাগলো, কাকাতুয়ার অনুসন্ধানে বেরুলে পৃথিবীরও অনেক কিছু তার দেখা হয়ে যাবে।

সমস্যা বাধলো ঘোড়া নিয়ে। একটা ঘোড়া তার আছে বটে, কিন্তু সে বড় রুগ্ন ঘোড়া। এই দীর্ঘপথ যাওয়া-আসা করা তার কম্মো নয়! অনেক ভেবে-চিন্তে সে গেল রাজার কাছে। গিয়ে বললো,—মহারাজ, আমি সোনালী কাকাতুয়ার সন্ধানে যাব; আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।

এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী তাকে টেনে তুলছেন ঘুম থেকে। [পৃঃ ১২৫

চাষার ছেলের কথা শুনে রাজা তো হেসেই অস্থির। বলে কি ছেলেটা? ডাইনীদের ভয়ে বড় বড় বীর এগোতে পারলো না, আর একটা চাষার ছেলে কিনা—?

রাজার হাসিতে ক্ষুণ্ণ হয়ে সে বললো,—আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাই না মহারাজ, অর্দ্ধেক রাজ্যও আমি চাই না। আমি যদি কাকাতুয়া এনে দিয়ে আপনার সংসারের অশান্তি দূর করতে পারি, সেইটুকুই আমার আনন্দ!

রাজা আহত হয়ে বললেন,—না, না, সে কথা বলছি না। ব্যাপার কি জানো, যেখানে তুমি কাকাতুয়া আনতে যাবে, সেটা হল ডাইনীদের দেশ। অসংখ্য ডাইনী সেখানে থাকে···

চাষার ছেলে বললো,—তা আমি জানি মহারাজ, প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়েই আমি সেখানে যাব। আমি দেখতে চাই ডাইনীরা কেমন, সে-দেশ কেমন, আর দেখতে চাই পৃথিবীর আজব জিনিষ সোনালী রঙের কাকাতুয়া!

আর বাধা না দিয়ে রাজা তাকে একটি সুন্দর ঘোড়া দিলেন, আর পাথেয়-স্বরূপ দিলেন এক

থলি মোহর। মনের আনন্দে চাষার ছেলে তখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তীরের বেগে টগ্‌বগিয়ে ছুটে চললো ঘোড়া।

দশ দিন, দশ রাত চলার পর এক পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছলো চাষার ছেলে। চারিদিকে চেয়ে দেখে কোথাও কোন বাড়ি-ঘর নেই—কেবল ছবির মত একটা সবুজ পাহাড়, স্বচ্ছ রূপালী ঝর্ণা, আর শ্যামল বনানীতে চারদিক ছাওয়া। চাষার ছেলের পিপাসা পেয়েছিল খুব। ঘোড়া থেকে নেমে পেটভরে ঝর্ণার ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিল। মাথার ওপরে দুপুরের প্রখর সূর্য্য। শরীর ক্লান্ত হয়ে এসেছে। তাই সে পাহাড়ের পাদদেশে একটা ঝাঁকড়া গাছের ছাওয়ায় শুয়ে পড়লো একটু জিরিয়ে নেবার আশায়। কিন্তু ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন যে দুচোখে ঘুম নেমে এলো, সে টেরই পেল না!

ঘুম তার ভাঙলো কোন মানুষের ডাকে। চেয়ে দেখে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী তাকে টেনে তুলছেন ঘুম থেকে। তারপর সন্ন্যাসী চাষার ছেলের কাছ থেকে জানতে চাইলেন, কেন সে এখানে এমনভাবে শুয়ে আছে? কোথা থেকে সে আস্‌ছে···কোথায় সে যাবে?

চাষার ছেলে সব কথা খুলে বললো তাঁকে। শুনে তিনি বললেন,—সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা—সেখানে গেলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না!

চাষার ছেলে বললো,—কিন্তু কাকাতুয়া নিয়ে যে আমাকে ফিরতেই হবে ঠাকুর! আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, যেমন করেই হোক, রাজবাড়ির দুঃখ আমি ঘোচাবই! বলুন ঠাকুর, একেবারেই কি এর কোন উপায় নেই?

খানিকক্ষণ পর সাধু বললেন,—আছে একটা উপায়। কিন্তু সে বড় শক্ত কাজ। শোন বলছি,—ঐ যে ডাইনীদের দেশ, ওটা হল মায়ার দেশ! ওখানকার ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত—সব কিছু মায়ার সৃষ্টি! আর ঐ মায়ার একমাত্র কারণ হল, ঐ সোনালী রঙের কাকাতুয়া!

চাষার ছেলে অবাক হয়ে শুনতে থাকে, ডাইনীদের দেশের আজব গল্প।

সাধু বলতে থাকেন,—বহুকাল আগেকার কথা বলছি। তখন ডাইনীদের কোন দেশ ছিল না; যে যেখানে পারত, লোকসমাজের আড়ালে দিন কাটাতো। একদিন তারা সকলে একজোট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করলো। নিরুদ্বেগে বসবাস করতে পারে, এমন আশ্রয়। লোকসমাজে ঢুকলে সকলেই তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত, এমন কি বাগে পেলে রীতিমত মারধোর পর্য্যন্ত করতো। করবেই তো! ডাইনীদের স্বভাব বড় কুটিল! সর্ব্বদাই ওরা মানুষের অনিষ্টচিন্তা করে।

যাই হোক, ওদের প্রার্থনায় বিষ্ণু তো রাজী হলেন। বললেন,—বেশ, তোমাদের জন্যে একটা দেশ আমি তৈরী করে দেব। লোকালয় থেকে বহু দূরে—সাত সমুদ্দুর-তেরো নদীর ওপারে হবে সেই দেশ। তোমরা যেমন মায়াবিনী, তেমনি তোমাদের দেশের সবকিছুও হবে মায়ায় তৈরী। আমি তোমাদের একটা সোনালী রঙের কাকাতুয়া দেব···সেই কাকাতুয়া নিয়ে তোমরা চলে যাবে সাত সমুদ্দুর-তেরো নদীর ওপারে। গিয়ে কাকাতুয়াটা তোমরা উড়িয়ে দেবে আকাশে। অমনি দেখবে একটা সুন্দর দেশ তৈরী হয়ে গেছে। ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, নদ-নদী সব কিছু। আর হবে একটা পাহাড়। পাখীটা উড়ে গিয়ে বসবে ঐ পাহাড়ের চূড়োয়। পাহাড়ের চূড়ো ছেড়ে কাকাতুয়া আর কোথাও যাবে না। পাহাড়ের ওপর থাকবে অসংখ্য ফলের গাছ···ঐ ফল খেয়েই বেঁচে থাকবে কাকাতুয়া।

কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি,—ঐ সোনালী কাকাতুয়া যতদিন ঐ পাহাড়ের চুড়োয় থাকবে, ততদিন থাকবে তোমাদের দেশ। যদি কেউ পাখীটা চুরি করে নিয়ে যায়, বা কোন দুষ্ট লোক যদি অকালে পাখীটার জীবন নাশ করে, তাহলে তোমাদের দেশও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও মৃত্যু ঘটবে। এ কাকাতুয়ার পরমায়ু হবে একশো বছর। একশো বছর পূর্ণ হবার কয়েকদিন আগে তোমরা আসবে আমার কাছে, আমি আবার নতুন কাকাতুয়া দেব।

বিষ্ণুর কথায় রাজী হয়ে ডাইনীরা নতুন দেশের পত্তন করে বসলো, এবং কাকাতুয়া যাতে চুরি না যায়, আর কেউ যাতে ওর প্রাণনাশ করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দিনাতিপাত করতে লাগলো। পাহাড়ের চারিদিকে ডাইনীদের প্রখর দৃষ্টি—যাতে কেউ পাহাড়ে না ওঠে! ভুলক্রমে কোন মানুষ ডাইনীদের দেশে এসে পড়লে ডাইনীরা তৎক্ষণাৎ তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে! কাজেই বুঝতে পারছো, কী ভয়ঙ্কর সে দেশ!

চাষার ছেলে ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ সে বেশ ভালই বুঝতে পারছে।

সাধু বলতে লাগলেন,—আজও তারা সেইভাবেই বসবাস করছে। কত যুগ কেটে গেছে। কাকাতুয়া চুরি বা তার প্রাণনাশ কেউ করেনি এপর্য্যন্ত। একশো বছর পূর্ণ হবার আগেই ডাইনীরা বিষ্ণুর কাছ থেকে নতুন কাকাতুয়া এনে উড়িয়ে দেয়। তুমি যদি পারো একাজ করতে, তাহলে সুবর্ণগড় রাজবাড়ির যেমন উপকার হবে, তেমনি সমগ্র পৃথিবীরও একটা মস্ত উপকার হবে।—নির্ব্বংশ হয়ে যাবে সমস্ত ডাইনীরা! ঐ ডাইনীরা কি কম ক্ষতি করে মানুষের? গভীর রাতে সাত সমুদ্দুর-তেরো নদী ডিঙিয়ে, লোকালয়ে এসে ওরা বহুলোকের অনিষ্ট করে?

আচ্ছা, এবার শোন আসল কথা। একবার ঐ ডাইনীদের দেশে দু'জন ডাইনীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধে। একজন হল বুড়ি ডাইনী, আর একজনের বয়স অল্প। ওদের ঝগড়া দেখে বহু ডাইনী জড়ো হয়ে গেল, এবং তারা সবাই যোগ দিল কমবয়সী ডাইনীর দিকে। অথচ সত্যিকারের দোষ ছিল কমবয়সী ডাইনীটার। অবিচার দেখে ডাইনী বুড়ি রাগে গজগজ করতে লাগলো, আর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে লাগলো। বুড়ি যত রাগে, অন্যান্য ডাইনীদের আনন্দ তত বাড়ে। তারা বুড়িকে ঘিরে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। তারপর তারা শেষ পর্য্যন্ত বুড়ির মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে সে-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলো। বুড়ি আর কি করে? মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে সমুদ্র ডিঙিয়ে এপারে এসে অনেক কষ্টে একটা কুঁড়েঘর তৈরী করে বসবাস করতে লাগলো। শুনেছি, আজও সে সেখানে বাস করে।

এখন ব্যাপার হল কি জানো? ঐ বুড়ির ভয়ানক একটা রাগ আছে সেই ডাইনীদের ওপর। তারা যদি নির্ব্বংশ হয়ে যায়, তাহলে বুড়ির খুব আনন্দ হবে! তুমি যদি ঐ বুড়ি ডাইনীকে সন্তুষ্ট করে ডাইনীদের দেশে গিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কাকাতুয়াটাকে উদ্ধার করবার কৌশল তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারো, তবেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে! নইলে তুমি সাগর পার হতেও পারবে না, যদিও বা কোনরকমে পার হও, ডাইনীদের দেশে গিয়ে রেহাই পাবে না! সে-দেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি তাদের পেটে চলে যাবে! ডাইনীরা মন্ত্রের জোরে বহু অলৌকিক কাজ করতে পারে। কিন্তু একজন ডাইনী আর একজন ডাইনীর ওপর তার মন্ত্রশক্তি খাটাতে পারে না! মন্ত্র সে ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু একজন মানুষকে মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান

করে যে-কোন ডাইনী সেই মানুষের সাহায্যে আর একজন ডাইনী বা ডাইনীগোষ্ঠীর ক্ষতি করতে পারে! সেই জন্যেই বলছি, বুড়ি যদি তোমাকে সাহায্য করতে রাজী হয়, তাহলে তুমি স্বচ্ছন্দে সাগর পার হতে পারবে, আর কাকাতুয়া উদ্ধার করে ডাইনীদেরও ধ্বংস করতে পারবে।

কখন যে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে, চাষার ছেলের খেয়ালই নেই। দেখতে দেখতে আঁধার গাঢ় হয়ে এলো। তারকা-রাজ্যের মেয়েরা হাজারো বাতি নিয়ে ফুটে উঠলো আকাশে। সাধু বললেন,—এখন এই পর্য্যন্ত থাক, কাল সকালে যা বল্‌বার বলে দেব আবার। আজ রাতটা আমার গুহাতেই বিশ্রাম করবে এসো। কাল ভোরে উঠে রওনা হবে।

সাধু তাকে গুহায় এনে কিছু ফল আর ঝর্ণার মিষ্টি জল খেতে দিলেন। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো চাষার ছেলে।

পরদিন খুব ভোরেই পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল তার। সাধুর কাছ থেকে পথের নিশানা আর উপদেশ নিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সোজা দক্ষিণমুখো।

টগ্‌বগ্‌···টগ্‌বগ্‌···টগ্‌বগ্‌···

বিদ্যুৎবেগে ছুটে চললো ঘোড়া। কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী পিছনে ফেলে এগিয়ে চললো চাষার ছেলে। আঁধার ঘনিয়ে এলে কোন গাছের গোড়ায় ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে গাছের ওপর সে রাত কাটায়। ভোরে আবার যাত্রা সুরু করে। এমনিভাবে পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি চলার পর সে এসে পৌঁছলো এক গভীর সেগুনবনের ধারে। সাধুর কথামত ঠিক পথে আসতে পেরেছে ভেবে খুব আনন্দ হল চাষার ছেলের। সাধু বলেছিলেন,—পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি সোজা দক্ষিণমুখো চললে তুমি একটা সেগুনবন দেখতে পাবে। সেই বনের পশ্চিম দিকে আছে একটা নদী, আর সেই নদীর পাড়ে আছে ডাইনীবুড়ির ঘর।

চাষার ছেলে এবার পশ্চিমদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিছুদূর অগ্রসর হতেই নদী আর ডাইনী-বুড়ির ঘর সে দেখতে পেলো। তখন ঘোড়াটাকে বনের আড়ালে লুকিয়ে বেঁধে রেখে ডাইনী-বুড়ির ঘরের দিকে এগিয়ে চললো। গিয়ে দেখলো, দরজা বন্ধ। সে তখন দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে ডাকতে লাগলো,—ও পিসি, পিসি গো···বাড়ি আছো?

—কে ডাকে?—ঠিক মেঘ ডাকার মত আওয়াজ হল। ভড়কে গেল চাষার ছেলে। কিন্তু সাধুর উপদেশ স্মরণ করে মনে সাহস এনে বললো,—আমি গো আমি! দরজাটা একবার খুলে দেখোই না!

ডাইনীবুড়ি ভেতর থেকে তেমনি কর্কশকণ্ঠে বললো,—আমি কে? আমি তো সবাই! মজাটা দেখ্‌বি! ইয়ার্কি মারা একেবারে ঘুচিয়ে দেব!

—আহা চট্‌ছো কেন পিসি? আমি নন্দ···তোমার ভাইপো নন্দ!

বুড়ি এবার দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, তারপর চাষার ছেলের আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগলো। চাষার ছেলে হেসে বললো,—আমাকে চিনতে পারছো না পিসি? তুমি আমার মাসতুতো দাদার খুড়তুতো ভায়ের পিসি হও যে! তাইতো তুমি আমারো পিসি। সেই কদ্দিন আগে তোমাকে দেখেছি! তোমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না? কী যে ভুলো মন তোমার!

বুড়ি ভাবলো, এই সামান্য ছোঁড়াটার কাছে হেরে যাবে সে? তাই ফোকলামুখে এক গাল হেসে বললো,—হুঁ! এবার তোকে চিনতে পেরেছি! তুই এতো বড়টা হয়ে গেছিস্! আয়, আয়,

ঘরে আয়! আমি কি তোকে ভুলতে পারি? তুই যখন এত্তোটুকু ছিলি, তখন তোকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি!

ঘরে গিয়ে আলাপ যখন খু-ব জমে উঠলো, সেই সময় চাষার ছেলে বললো,—আমি তোমার কাছে কেন এসেছি জানো পিসি? শুনেছি ডাইনীরা তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! শুনে আমার এত রাগ হল, কি বলবো তোমায়! তোমার দোষ নেই, ঘাট নেই, মিছিমিছি তোমাকে তাড়িয়ে দিল! শুনেই আমি ছুটে আসছি তোমার কাছে! আমি ওদের শাস্তি দিতে চাই পিসি!

ডাইনী খুশীতে গদগদ হয়ে বললো,—তুই আর জন্মে আমার ছেলে ছিলি রে নন্দ—নইলে আমার জন্যে তোর এত প্রাণ কাঁদে? তুই যদি ওদের শাস্তি দিতে পারিস, তাহলে তোকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করবো। কিন্তু সে যে বড় শক্ত কাজ রে নন্দ!

চাষার ছেলে বললো,—তা হোক! তোমার ভালোর জন্যে আমি কোনো কাজেই পিছপা হবো না! নিজের জীবনও যদি দিতে হয়, তাতেও রাজি আছি!

বুড়ি খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে বললো,—তুই আমার ভাইপোর উপযুক্ত কথা বলেছিস্ বটে নন্দ! ওদের শাস্তি দেওয়া যায় বটে, কিন্তু কি জানিস্, সে বড় সাধনার কাজ! আগে পুরো একটি বছর ধরে তোকে বাঁশি বাজানো শিখতে হবে, তারপর অন্য কথা।

চাষার ছেলে বললো,—আমি বাঁশি বাজাতে জানি পিসি; দেখবে বাজাব?

সে তার প্রিয় বাঁশিটিকে সঙ্গে এনেছিল। বোঁচকার মধ্যে থেকে সেটা বার করে বাজাতে লাগলো। বাঁশির সুর শুনে অবাক হয়ে গেল বুড়ি! এত সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারে মানুষে? মুগ্ধকণ্ঠে বুড়ি বললো,—তুই পারবি নন্দ, ডাইনীদের নির্ব্বংশ করতে তুই পারবি! তোকে একটা সুর শিখিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে শোন্। সেই সুরে তোকে বাঁশি বাজাতে হবে।

তারপর বুড়ি নন্দর কাছ থেকে বাঁশিটা নিয়ে একটা অদ্ভুত সুর বাজিয়ে শোনালো। বললো, —পারবি এরকম বাজাতে?

—পারবো। কিন্তু এ বড় বিশ্রী সুর পিসি—খুব ভয় করে!

—করবেই তো। এ-সুরের নাম 'জটংরাক্ষসী' সুর! ডাইনীদের দেশে গিয়ে এই সুরে বাঁশি বাজালে সমস্ত ডাইনী ঘুমিয়ে পড়বে।

—সত্যি পিসি?

—খুব সত্যি!

তারপর বুড়ি কানে কিসের একটা শেকড় গুঁজে বললো,—বাজাতো দেখি জটংরাক্ষসী সুরে, কেমন বাজাতে পারিস দেখি!

চাষার ছেলে বললো,—কানে ওটা কি দিলে পিসি?

—এটা একটা গাছের শেকড়; এটা কানে দিলে আর ঘুম আসে না! নইলে আমিও যে ঘুমিয়ে পড়বো! কিন্তু আমরা বাজালে আমাদের ঘুম আসে না! মানুষে বাজালেই বিপদ!

তারপর নন্দ জটংরাক্ষসী সুরে বাঁশি বাজালো। শুনে বুড়ি বললো,—চমৎকার! আমার চেয়েও তুই অনেক ভালো বাজাতে পারিস্ নন্দ! তুই পারবি ওদের ধ্বংস করতে···ওই দেশে যত ডাইনী আছে, সব্বাই ধ্বংস হয়ে যাবে···আমার মনের সাধ মিটবে!

নন্দ বললো,—এবার আমাকে কি করতে হবে বলো ?

—সব বলবো। আজকের দিনটা এখানে থাক্, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলবো।

—কিন্তু পিসি—?

—কি রে ?

—সাগর পার হতে পারবো তো ?

—খুব পারবি। সাগরে আমার পোষা একটা ঝিনুক আছে, সে-ই তোকে পার করে দেবে। তোকে একটা ছড়া শিখিয়ে দেব, সাগরের ধারে গিয়ে সেই ছড়াটা তুই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবি, অমনি দেখবি প্রকাণ্ড একটা ঝিনুক তোর কাছে আসবে। সে এলে তার ওপর চড়ে বসবি! কিছু বলতে হবে না···সে ঠিক তোকে পৌঁছে দেবে আমাদের দেশে।

* * *

পরদিন সকালে উঠে নন্দ ঘোড়ায় চড়ে আবার রওনা হল। বুড়ি তাকে অনেক কিছু বলে দিয়েছে। সেই কথাগুলো স্মরণ করতে করতে সে তীরের বেগে এগিয়ে চললো।

ঠিক সন্ধ্যের সময় এসে পৌছালো সে সাগরের ধারে। ঘোড়াটাকে একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে রেখে জলের কিনারায় এসে সে চীৎকার করে বলতে সুরু করলো,—

ক্লীং হুট্ ক্লীং হুট্ সাগর-জলে বাস,
পিঠটি উঁচু লম্বা গলা ডাইনীবুড়ির দাস।
ক্লীং হুট্ ক্লীং হুট্ আয় রে ছুটে আয়,
ডাইনীবুড়ির আজ্ঞা আছে, ভাসবো দরিয়ায়!

নন্দ জীবনে কোনদিন সমুদ্র দেখেনি। দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

অমনি প্রকাণ্ড এক ঝিনুক জল থেকে ভুস্ করে উঠে নন্দর সামনে হাজির হল। নন্দর আনন্দ আর ধরে না। সে ডাইনীবুড়িকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে ঝিনুকের ওপর চড়ে বসলো। ঝিনুক অমনি হু হু করে ছুটে চললো জলের ওপর দিয়ে।

নন্দ জীবনে কোনদিন সমুদ্র দেখে নি। দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল! এত জল! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে চলে ঝিনুক···কিন্তু জলের আর শেষ হয় না! শুধু জল, জল আর জল!

চলেছে তো চলেছেই। চলার যেন বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। নন্দ অপলক নেত্রে চেয়ে আছে জলের দিকে। চাঁদের আলোয় কি সুন্দর ঝিক্মিক্ করছে সাগরের বুকটা!

ক্রমে এক সময় পুব-আকাশ ফিকে হয়ে এলো। বুড়ি বলে দিয়েছে, ভোরে ঝিনুক পৌঁছবে ডাইনীদের দেশে। তাই নন্দর মনে-প্রাণে উত্তেজনা জাগলো।

চতুর্দ্দিক যখন বেশ ফর্সা হয়ে এলো, সেই সময় ঝিনুক নন্দকে নামিয়ে দিল ডাইনীদের দেশের মাটিতে। নন্দ দেখলো, কত বাড়ি-ঘর সেদেশে। অসংখ্য ডাইনী ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। নন্দকে দেখেই তারা হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো।

নন্দ প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে তখুনি জটংরাক্ষসী সুরে বাঁশি বাজাতে সুরু করলো। অমনি যেখানে যত ডাইনী ছিল, সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। যারা নন্দর দিকে ছুটে আসছিল, তারা ধপাধপ মাটিতে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলো।

বুড়ি বলে দিয়েছে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ওরা ঘুমুবে। তারপর জেগে উঠবে আবার। এরই মধ্যে সে যেন কাকাতুয়া চুরি করে পালিয়ে আসে। যদি তা না পারে, তাহলে ডাইনীরা জেগে উঠলেই সে যেন আবার বাঁশি বাজিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

নন্দ চেয়ে দেখলো, অনেকটা দূরে রয়েছে সেই পাহাড়টা। আর পাহাড়ের মাথায় সূর্য্যের আলো লেগে কি যেন একটা সোনার মত জল্‌জল্‌ করছে। দূর থেকে জিনিষটা কি বোঝা না গেলেও, অনুমানে নন্দ বুঝলো ওইটাই সেই সোনালী কাকাতুয়া!

নন্দ যখন পাহাড়টার গোড়ায় এসে পৌঁছলো, সূর্য্যদেব তখন অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছেন। আর কালবিলম্ব না করে সে পাহাড়ের ওপর উঠতে সুরু করলো। ভয় হল, এত উঁচু খাড়াই পাহাড়··· পা ফস্কে পড়ে যাবে না তো? একবার পা ফস্কালে আর রক্ষে নেই! হাড়গোড় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে! খুব সন্তর্পণে সে উঠতে লাগলো।

অর্দ্ধেকটা উঠে সে চাইলো চুড়োর দিকে। এবার আর কাকাতুয়াকে চিনতে তার কষ্ট হয় না। সূর্য্যের আলো লেগে দপ্‌ দপ্‌ করে পাখীটা জ্বলছে যেন। মনে হয় না সোনালী রঙের পাখী—যেন খাঁটি সোনার তৈরী! একটু জিরিয়ে নিয়ে নন্দ আবার পূর্ণোদ্যমে উঠতে লাগলো ওপরের দিকে।

উঠতে উঠতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এলো। আর যেন সে উঠতে পারে না! হাত-পা ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আস্‌ছে···তবু উঠতে থাকে।···এই যে পাহাড়ের চুড়োর প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে সে। আর মাত্র কয়েক হাত······তারপরই সে পাখীটাকে······ঐ যাঃ! পাখীটা নন্দকে দেখে উড়ে গেল! বুড়ি বলে দিয়েছে, যদি উড়ে যায়, তখুনি আবার ফিরে আসবে। নন্দ যেন চুড়োর আড়ালে চুপচাপ বসে থাকে···যেই এসে বসবে, অমনি সে যেন জালটা ছুড়ে দেয় পাখীটার দিকে। বলা বাহুল্য, পাখীটাকে ধরার উপযোগী একটা ছোট জাল নন্দ পেয়েছে বুড়ির কাছ থেকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না নন্দকে। একটু পরেই ডানার পত্‌পত্‌ আওয়াজে সে উঁকি দিয়ে দেখলো, পাখীটা ফিরে এসেছে। অমনি সে ছুড়ে দিল জালটা···বন্দী হল বহু আকাঙ্ক্ষিত কাকাতুয়া।

জালের মধ্যে বন্দী কাকাতুয়াকে নিয়ে নন্দ আবার নামতে সুরু করলো। সমতলে যখন পৌঁছলো, তখন সূর্য্য অস্ত গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই ডাইনীরা আবার জেগে উঠবে। কিন্তু নন্দর প্রাণে ভয় নেই। কিসের ভয়? বাঁশিতে ফুঁ দিলেই তো সব ঠাণ্ডা!

অর্দ্ধেক পথ যেতে না যেতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পথ দেখে নন্দ এবার প্রায় ছুটতে সুরু করে দিল। হঠাৎ চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। সামনেই রাস্তার

ওপর একটা বুড়ি ডাইনী চিৎপাত হয়ে ঘুমুচ্ছিল। সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। নন্দ তখন ঠিক তার সামনে গিয়ে পড়েছে। আর যায় কোথা? বুড়ি চীৎকার করে উঠলো,—কে রে তুই?

নন্দ ভয়ে ভয়ে বললো,—আ-আ-আমি? আমি তোমার নাতি দিদিমা!

—বটে! বটে রে নাতি! আজ তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খাব!

বলে বুড়ি উঠে দাঁড়ালো। নন্দ তখুনি বাঁশিটা মুখে তুলে নিয়ে জটংরাক্ষসী সুরে বাজাতে লাগলো। বুড়িও অমনি কুপোকাৎ! মাটিতে পড়ে ভোঁস্ ভোঁস্ করে নাক ডাকাতে লাগলো।

বিপদ দূর হল···তারপর নির্বিঘ্নে সে এসে পৌছলো সাগরের ধারে। পৌছে ঝিনুককে ডেকে তার ওপর উঠে বসলো। ঝিনুক শোঁ শোঁ করে এগিয়ে চললো।

পিছন ফিরে ডাইনীদের দেশের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল নন্দ! ধূ ধূ করছে ফাঁকা মাঠ! কোথায় গেল ঘর-বাড়ি, গাছপালা···কিছু নেই! একেবারে শূন্য···শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করছে!

পরদিন সকালে এপারে পৌছে ঝিনুক নামিয়ে দিল নন্দকে। নন্দ বললো,—ধন্যবাদ ঝিনুক-দাদা, তুমি আমার অনেক উপকার করেছো!

তারপর সে ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল স্বর্ণগড় রাজ্যের দিকে। টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌···তীরের বেগে ছুটে চললো ঘোড়া।

* * * *

স্বর্ণগড় রাজ্যে মহা ধুমধাম পড়ে গেছে। সবার মুখেই এক কথা—অমুক চাষার ছেলে ডাইনীদের দেশ থেকে সোনালী রঙের কাকাতুয়া ধরে এনেছে! অমন বীর আর ত্রিভুবনে কেউ নেই!···কাকাতুয়া আর চাষার ছেলেকে দেখবার জন্য রাজবাড়িতে লোকে-লোকারণ্য!

রাজবাড়ির লোকজনেরও আনন্দের শেষ নেই। রাজার মুখে হাসি, রাণীর মুখে হাসি, পাত্র-মিত্র-সভাসদ্‌দের মুখে হাসি···আর রাজকন্যা—সে তো কাকাতুয়াকে পেয়ে নাচতে সুরু করে দিয়েছে!

পরদিনই বিয়ের আয়োজন করা হল। দেশের সমস্ত প্রজাদের নিমন্ত্রণ করা হল সে বিয়েতে। সে কি হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড! এমন সময় চাষার ছেলে জানালো, বিয়ে সে করবে না! শুনে আনন্দ কোলাহল থেমে গেল মুহূর্ত্তে! রাজা এসে বললেন,—তা হয়না বাবা; আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে কাকাতুয়া এনে দিতে পারবে···

চাষার ছেলে বললো,—তা জানি মহারাজ! কিন্তু বিয়ে আমি করবো না···আপনি দেখে-শুনে রাজকন্যাকে ভাল পাত্রের সাথে বিয়ে দিন।

রাজা বললেন,—তোমার চেয়ে ভাল পাত্র আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই—তুমি এ বিয়েতে অমত করো না।

রাজা, রাণী, পাত্র-মিত্র, মন্ত্রীবর্গ—সবাই অনুরোধ করলেন; কিন্তু চাষার ছেলের সঙ্কল্প কেউ ভঙ্গ করতে পারলেন না। সে আরও জানালো যে, অর্দ্ধেক রাজ্যও সে চায় না! অবশেষে নিরুপায় হয়ে রাজা বললেন,—বেশ, তোমাকে ও-বিষয়ে আর অনুরোধ করবো না। কিন্তু শুধু হাতেও তো তোমাকে বিদায় দিতে পারি না বাবা···তুমি তোমার খুশীমত আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নাও।

চাষার ছেলে একটু ভেবে বললো,—আমার বড় ইচ্ছা মহারাজ, সারা পৃথিবীটা আমি ঘুরে বেড়াই! পৃথিবীর যেখানে যত অজানা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখবার এবং জানবার আছে, সব আমি

দেখবো জানবো—এই আমার ইচ্ছা! কিন্তু আমার এমন একটা ভাল ঘোড়া নেই মহারাজ, যে আমাকে সারা পৃথিবীটা ঘুরিয়ে আনতে পারে। আপনি যদি দয়া করে আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দেন, তাহলে আমার বাসনা পূর্ণ হতে পারে!

মহারাজ তখুনি ঘোড়াশাল থেকে সবচেয়ে সেরা-ঘোড়াটি এনে চাষার ছেলেকে দিলেন। ধব্‌ধবে সাদা রঙ্…যেমনি নিটোল স্বাস্থ্যবান্ চেহারা, তেমনিই বিরাট দেহ! খুশী হয়ে চাষার ছেলে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে বসলো,—আসি মহারাজ! বিদায়!

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে।

টগ্‌বগ্…টগ্‌বগ্…টগ্‌বগ্…

চাষার ছেলেকে পিঠে নিয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত উল্কার গতিতে ছুটে চললো শ্বেত অশ্ব। যতক্ষণ দেখা গেল, রাজবাড়ির সমস্ত লোক অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে…

একটুখানি হাসো

—শ্রীকল্যাণ সেনগুপ্ত

গত বছরে আমাদের সংস্কৃত পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন এসেছিল—"'ভ্রাতৃ' শব্দের দ্বিতীয়ার রূপ লিখ।" আমাদের ক্লাশের হাবুল তার উত্তরে কি লিখেছিল জান? সে লিখেছিল—

"'ভ্রাতৃ' শব্দের দ্বিতীয়ার রূপ লিখিতে গেলেই মনে পড়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কথা অর্থাৎ ভাইফোঁটার কথা! এই দিনটি সত্যিই আনন্দময়। এই দিনে ঘরে ঘরে ভাইদের মধ্যে যেন আনন্দের রোল পড়িয়া যায়।……

"কেবল যাহাদের বোন নাই, তাহারাই এই দিনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে না।…ইহাই 'ভ্রাতৃ' শব্দের দ্বিতীয়ার অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার রূপ!"

* * * *

এক আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক বৈজ্ঞানিকের তুমুল তর্ক চল্‌ছে। তর্ক চল্‌ছে টেলিফোন নিয়ে—কাদের দেশের টেলিফোন বেশী ভাল।

আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বল্‌ছে—"জান? আমাদের দেশের টেলিফোনে শব্দ এত তাড়াতাড়ি চলে যে, কথা বলবার পর শুনতে এক সেকেণ্ডও দেরী লাগে না।"

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকটি ব্যঙ্গ ক'রে একটু হেসে বললেন—"এই নিয়েই তুমি এত গর্ব্ব করছো? আমাদের দেশের টেলিফোনে এর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি কথা শোনা যায়।"

আমেরিকান বৈজ্ঞানিকটি অবাক্ হয়ে বলে, "সে কি! এর চেয়েও তাড়াতাড়ি শোনা যায়?"

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গম্ভীরভাবে বলে, "হ্যাঁ, এর চেয়েও তাড়াতাড়ি। আমাদের দেশের টেলিফোনে কথা বলবার আগেই সব কথা শোনা যায়!"

আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের চোখ দু'টো ছানাবড়ার মত গোল হ'য়ে ওঠে!

ইস্কাবনের টেক্কা

—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

[**পূর্ব্বকথা**। অনিতা সেন গরীবের মেয়ে। সংসারের চাহিদায় তাকে নিতে হয় টাইপিষ্টের চাকরী। অফিসের সেক্রেটারী এবং সর্ব্বেসর্ব্বা দামোদর ভট্চাষ্যির অনুরোধে একদিন সে তাঁকে এঁকে দেয় একটা ইস্কাবনের টেক্কা। কয়েকদিন পরে অনিতা খবরের কাগজে পায় এক ডাকাতির সংবাদ। ডাকাতরা প্রথমে কোন ধনীকে পাঠায় একটা ছাপানো 'ইস্কাবনের টেক্কা', তার অর্থ এক লক্ষ টাকা দাও। অন্যথায় পাঠায় হাতে-আঁকা টেক্কা, অর্থ মৃত্যু। তাহলে, দামোদর কি ডাকাত! নরহন্তা! অনিতা নিজেও তো তাহলে এই পাপের সাথে জড়িত! না, সে আজ দামোদরের সাথে বোঝাপড়া করবে। কিন্তু অফিসে আজ দামোদর অনুপস্থিত। তবে কি সে পালিয়েছে? হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। সহকারী সেক্রেটারী অনিল মুখুজ্যে টেলিফোন ধরেন। পুলিশের ফোন; দামোদর ভট্চাষ্যির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লাশ সনাক্ত করবার জন্য ডাকছে সবাইকে।]

দুই

লাশ দামোদর ভট্চাজ্যিরই বটে!

বিশাল চওড়া রাস্তা, মাঝখানটা বরাবর পিচ-ঢাকা; তার দু'ধারে খোয়ার উপরে বালি ছড়ানো। সেই বালিরই প্রান্তরেখায় বড় একটা গাছের আড়ালে প'ড়ে আছে দামোদরের দেহ।

পুলিশ ত' এসেছেই, আর এসেছে কৌতূহলী জনতার ভিড়। ভিড় ঠেকিয়ে রাখবার জন্য পুলিশ দাঁড়িয়েছে লাশটাকে ঘিরে। তাদের লাইন পেরিয়ে তবে অনিল-বাবুর দল লাশের কাছে পৌঁছোতে পারলেন।

দলের ভিতর অনিতাও আছে। সে যে আসবে—তা অফিসের কেউ ভাবে নি। খুন-খারাবি ব্যাপারের ভিতর মেয়েরা সখ ক'রে এগুবে—এটা কেউ আশা করে না। তবু—'কে কে যাবেন চলুন'—অনিলবাবুর এই আহ্বানের উত্তরে অনিতা যখন চেয়ার ছেড়ে উঠে এল, তখন তাকে নিষেধ করবার কারণও কেউ দেখতে পেল না। গাড়ীতে জায়গার অভাব হবে না, কারণ অনিতা ছাড়া আর মাত্র দু'টি লোক যেচে এগিয়ে এল—অনিলের সঙ্গে যাবার জন্য। তারা হীরু আর সমরেশ।

কোন-কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে অনিতা আসেনি। এসেছে একটা ঝোঁকের বশে। মোটর যখন তাদের চারজনকে নিয়ে পাতিপুকুরের দিকে ছুটল, তার আগে সে বোধ-হয় ঠিকমত উপলব্ধি করেনি যে, কোথায় তারা যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে।

যে-জন্য আসা, তা সহজে মিটল না। "এই লাশ আমাদের সেক্রেটারি দামোদর-বাবুর"—স্রেফ এই কথাটুকু ব'লে রেহাই পেল না কেউ। পুলিশ তাদের নিয়ে গেল থানায়। সেখানে তাদের নাম-ঠিকানা লেখা হ'ল, সই-সাবুদ নেওয়া হ'ল, এবং আবারও পুলিশ তাদের ডেকে পাঠাবে সাক্ষী দেবার জন্য—এইটে বেশ পরিষ্কার ভাবেই তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।

এতক্ষণে অনিতার খেয়াল হ'ল যে, এ-ব্যাপারের ভিতর সাধ ক'রে মাথা গলানো তার পক্ষে নিছক বোকামি হয়েছে। সে নিজের জন্য নতুন কাজকর্ম্মের চেষ্টা করবে, না এই বুনো মোষ তাড়িয়ে বেড়াবে—ঘরের খেয়ে? আর, ঘরেও ত' খাবার জিনিষ বাড়ন্ত হয়ে এল!

ট্যাক্সিতেই ফেরা হচ্ছিল। শ্যামবাজারে পৌঁছেই অনিলবাবু দরজা খুলে নেমে পড়লেন, বললেন, "বাকী পথটুকু চলুন ট্রামে-বাসেই যাই! আগে খেয়াল করিনি—কে জানে এই ট্যাক্সিভাড়া অফিস থেকে আদায় করতে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। অফিস ত' বন্ধ হ'ল বোধ হয়!"

এই কথাটাই সকলের মনে উঁকি দিচ্ছিল এতক্ষণ, যদিও মুখ ফুটে কেউ প্রকাশ করেনি কিছু। অফিস বন্ধ হ'ল! অফিস বন্ধ হ'ল! এই যে-আচম্‌কা এত-বড় একটা খুন হয়ে গেল, তার জন্য এমন কিছু এসে-যেতো না এদের, যদি-নাকি অফিসটা ঠিক মত চলবার সম্ভাবনা থাকত। দামোদর মরেছেন, তাতে দুঃখ নেই; দুঃখ এই যে তিনি সবাইকে মেরে গিয়েছেন।

অনিলবাবু ভাড়া গুণে দিলেন ড্রাইভারকে। বলাই বাহুল্য যে তিনি হাসিমুখে দিলেন না। গ্যাসের আলোতে তাঁর মুখের বিকৃতি দেখে ড্রাইভারটা হেসে ফেলল। এরা যে মোটর চড়ার শ্রেণী নয়, তা সে বুঝতে পেরেছে।

"হামি গারিজ যাবে বাবু সাব! নবীন হালদার লেন মে! উস্-তরফ আপ্‌নে-লোক কোইকো মোকাম হোগা, তব্ গাড়ী মে চলা আইয়ে, খুসীসে পৌঁছা দেঙ্গে!" —বিনীত ভাবেই বলল সে।

"বল কি? তার জন্য পয়সা নেবে না?" অনিলবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন— "তা হ'লে—অনিতা দেবীর বাড়ী ত' ঐ দিকেই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চ'লে যান আপনি!"

অনিতার বাড়ী ঐদিকেই বটে, বিনা-পয়সার মোটরে এই এক মাইল রাস্তা যেতে পারলে ভালোই হয় বটে, কিন্তু অচেনা এই অতি-ভদ্র ড্রাইভারের কাছে দয়াগ্রহণ করতে

তার রুচি হ'ল না মোটেই। সে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, বলল—"এখানে কাছাকাছি আমার এক আত্মীয় আছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে একটা কাজের চেষ্টা করতে ব'লে যাব। আপনি চ'লে যান সিংজী!"

সিংজীর এতখানি ভদ্রতা মাঠে মারা গেল দেখে সে একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল যেন। অনিলবাবুর দিকে একবারটি তাকাল সে গাড়ী ছেড়ে দেবার আগে। অনিলবাবু বুঝলেন—চাহনিটা বেচারীর নির্ব্বাক্ নালিশ। তাই তিনি অনিতাকে বললেন—"অযাচিতভাবে ও আপনার উপকার করতে চাইছিল মিস্ সেন; প্রত্যাখ্যান ক'রে ওকে বোধহয় ব্যথা দিলেন।"

অনিতার কাছ থেকে জবাব আসবার আগেই হীরু ব'লে উঠল—"ও-রকম সুযোগ থেকে অনেক দুর্য্যোগ ঘটে থাকে হামেশা, মিস্ সেন ওর গাড়ীতে না চ'ড়ে বোধহয় ভালই করেছেন।"

অনিতা নমস্কার ক'রে বিদায় নিল সবাইয়ের কাছে। "কাল অফিসে আসছেন ত' সবাই?"—জিজ্ঞাসা করল নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই।

ঘাড় নাড়ল সবাই। "যতক্ষণ তালা না পড়ছে, আসব বই কি!"—বললেন অনিলবাবু।

অনিতা চ'লে গেল।

হীরু বলল—"আমরাও চলুন, বাস্-ট্রাম ধরি।"

"উঃ, কী ভীড় বাসে-ট্রামে!"—বলল সমরেশ,—"বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে যেন!"

"সিংজীর গারিজ নবীন হালদার লেন না হ'য়ে মৌলালিতে হ'লে বাঁচতাম যে!" অনিলবাবু আক্ষেপ ক'রে উঠলেন।

হা-হা ক'রে হেসে উঠল সমরেশ।—"আমাদের মত তিনটে মুষ্কো পুরুষকে বিনা-ভাড়ায় ও মৌলালি পৌঁছে দিত, এতখানি আশা আমি ত' করিনে অনিলবাবু! ও বোধহয় জানত যে নবীন হালদার লেনের দিকে একমাত্র অনিতা দেবীরই বাড়ী, আমাদের নয়!"

"না, না, তা কী ক'রে হবে?"—ঝাজের সঙ্গে প্রতিবাদ জানালেন অনিলবাবু।—"মানুষ যে নিঃস্বার্থ পরোপকারও ক'রে থাকে দুনিয়ায়, এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"

উত্তর দেবার চেষ্টা না ক'রে হীরু সমরেশ—"আসুন, আসুন"—বলতে বলতে ছুটল সেই স্থানটি লক্ষ্য ক'রে—যেখানে সেইমাত্র একখানা দোতলা বাস এসে দাঁড়িয়েছে।

অনিলবাবুও বোধহয় ছুটতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন—একখানা ত্রিপল-ঢাকা লরী এসে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তাঁর সম্মুখে; আর তা থেকে

লাফিয়ে নামছেন আধাবয়সী এক দাড়িগোঁফওয়ালা ভদ্রলোক, পরনে তাঁর নীল ফুলপ্যাণ্ট, আর গায়ে তাঁর হলদে বুশ্‌কোট।

"আরে, আরে ও হীরু, ও সমরেশ, উঠোনা বাসে, উঠোনা বাসে, আমাদের নিজেদের লরী এসে পড়েছে হঠাৎ। ও ভাই কর্ত্তার সিং, এলগিন রোডের দিকে যা'চ্ছ ত'? আমাদের যদি নিয়ে যাও!"

"জরুর!"—আধাবয়সী লোকটি ফুটপাথ পেরিয়ে পানের দোকানে গিয়ে হাঁক দিলেন—"এক পাকিট কাঁচি, জল্‌দি!"

হীরু, সমরেশ ডাকাডাকি শুনে এসে পড়ল, বাসের হাণ্ডেল ছেড়ে। "নিজেদের লরী" বস্তুটা কী, বোধগম্য না হ'লেও এসে পড়ল। অফিসের ত' নিজের লরী কোনদিন দেখা যায় নি এর আগে। অনিলবাবু তাদের মনের কথা আঁচ ক'রে নিয়ে আগে থেকেই বুঝিয়ে দিলেন—"আমাদের কোম্পানীর ঢের কাজ করে এরা। গুদামেই এদের যাতায়াত, তাই তোমরা দেখ নি কোনদিন।"

তা হবে, গুদামের খবর হীরু, সমরেশ সত্যিই কিছু রাখে না। এদিকে এক পাকিট কাঁচি কিনে কর্ত্তার সিং এসে দাঁড়াল অনিলবাবুর কাছে—"এ কী খোবর শুনতে হো'ল ওনিল বাবু? এমন আদমির এ-হাল হোবে, কে ভাবিয়েছিলো! এঃ হেঃ হেঃ—তব্ পুলিশ কী বোলে? কীসিকো উপর শোবে সন্দেহো—"

"না, কিছুই ত' বলছে না! তা, তোমার লরীতে আমাদের তিনজনের জায়গা হবে ত'? বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া—যদিও রোজ দু'বেলা সেইভাবেই যাই—তবু—"

কর্ত্তার সিং অনিলবাবুর সম্মুখে কাঁচির খোলা পাকিট এগিয়ে দিয়ে বলল—"হামি যোখন এসে পড়েছি, এবেলাটা না-হয় আরাম ক'রেই গেলেন; আসুন, আসুন—জায়গা হোবে না—কী কথা? তিন জন কেনো, তেরোজনের জায়গা হোবে!"

"তেরো জন আর হ'য়ে কাজ নেই,"—হীরু রসিকতা করল—"তেরো সংখ্যাটা সাহেবেরা বলে আন্‌-লাকী। বিপদের সূচনা করে ওটা। তেরো জনে একসাথে কোন কিছু করলে একজন মরে।"

গাড়ীতে উঠতে উঠতে কর্ত্তার সিং বলল—"তাতেও আপনাদের ভোয় ছিল না, আপনেরা ত' একজোনকে আগেই মেরে রেখেছেন।"

হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠল কর্ত্তার সিং, অনিল মৃদুহাস্য ক'রে তার কৌতুকের সমর্থন জানালেন। কিন্তু হীরু, সমরেশ চুপ ক'রে রইল, তাদের সদ্য-মৃত মনিবের কথা নিয়ে এ-রহস্য তাদের ভদ্ররুচিকে পীড়া দিল একটু।

* *

ওদিকে অনিতা তখন জোর-পায়ে গলিপথ বেয়ে চলেছে বাড়ীর দিকে। আত্মীয়-

দের বাড়ী সে যায় নি, যাওয়ার মতলবও তার ছিল না। অতি-ভদ্র ড্রাইভার-লোকটাকে ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করবার জন্যই সে আত্মীয়ের বাড়ীর কথা তুলেছিল।

বড় রাস্তার মোড় থেকে অনিতার বাড়ী এক মাইলের বেশী হবে ত' কম নয়। একেবারে যে সরু গলি, তা নয়। দু'দিক থেকে দু'খানা গাড়ী এসে পড়লেও স্বচ্ছন্দে পরস্পরকে পেরিয়ে যেতে পারে। কেবল একটা জায়গায় ছাড়া। সেই একটা জায়গা হ'ল স্বরাজ হোটেলের রাজত্ব। হোটেলের মালিক গলিটাকে নিজের উঠান ব'লে গণ্য ক'রে থাকেন। সেখানে টেবিল পেতে, চারদিকে টিনের চেয়ার সাজিয়ে রাখেন খরিদ্দারদের জন্য। খরিদ্দারেরাও দোকানের গুমোট ঘরের চাইতে রাস্তার খোলা হাওয়া স্বভাবতঃই পছন্দ করে।

কাজেই, ওখানটাতে পাশাপাশি দু'খানা গাড়ী চলা ত' দূরে থাক, টেবিল-চেয়ারের পাশ কাটিয়ে একখানার যাওয়াই কঠিন।

ঠিক সেইখানে পৌঁছেই অনিতাকে থামতে হ'ল। বাধ্য হয়েই থামতে হ'ল। স্বরাজ হোটেলের সম্মুখে যথারীতি সাজানো রয়েছে টেবিল-চেয়ার; এবং সেই টেবিল-চেয়ারের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে—একখানা মোটর। লোকজন কি চলছে না পথ দিয়ে? চলছে অবশ্য। তবে খুব স্বচ্ছন্দে নয়! মোটরের পাশ দিয়ে কা'ত হয়ে, একজন একজন ক'রে পেরিয়ে যাচ্ছে কোনমতে। যাদের হাতে রেশনব্যাগ-ট্যাগ আছে, তাদের সেটা কাঁধে বা মাথায় তুলে নিতে হচ্ছে পেরুবার সময়। মানুষ এবং ব্যাগ—একসাথে দু'টো জিনিষ গলবার জায়গা সেখানে নেই।

পথচারীরা আপত্তি করছে না?—করছে! কিন্তু কে শোনে সে-আপত্তি? মোটরওয়ালারা কবে পায়দল যাত্রীর নালিশে কর্ণপাত করেছে? বাঙ্গালী মোটর-ওয়ালাই করে না, এ ত' পাঞ্জাবী! সবিস্ময়ে অনিতা দেখল—সেই অতি-ভদ্র সিংজী মোটর থেকে নেমে দেহের তুলনায় অতি ছোট টিনের চেয়ারে জেঁকে বসেছেন এবং ধীরে সুস্থে আরামসে কামড় দিচ্ছেন একখানা নেড়ো বিস্কুটে।

আচ্ছা বেয়াক্কেল ত'!—মনে মনে গজরাতে গজরাতে অনিতা মোটরের পাশ দিয়ে গ'লে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

কিন্তু পা বাড়িয়েই সে পিছিয়ে এল এক পা। কেন এল, তা সে জানে না।

কিংবা, আধা-আধি রকম জানে। জানার কাজটা পূরোপূরি সমাধা হবার আগেই জানার প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছে তার দেহের উপর দিয়ে। তার আগু-বাড়ানো পা-খানাকে টেনে এনেছে পিছন পানে।

অর্থাৎ, পা বাড়িয়ে মোটর আর পাশের বাড়ীর দেয়ালের মাঝখানে আধ-হাত সুঁড়িতে প্রবেশ করবার মুখেই সে দু'টো জিনিষ যুগপৎ লক্ষ্য করেছে। দেখেছে যে

তার সম্মুখে মোটরের দরজা, আর খোলা দরজার পাশে ব'সে সিংজীর মতোই দাড়িওয়ালা এক দ্বিতীয় সিংজী।

অন্য জিনিষটা যা সে দেখেছে, তা হ'ল এই যে, সে মোটরের কাছে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে নেড়ো বিস্কুটখানা আস্ত মুখে ফেলে দিয়ে সিংজী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, এবং স্টার্ট দেবার জন্য মোটরের সম্মুখ দিকটায় এগিয়ে যাচ্ছে।

এ-দু'টোতে কী বোঝা যায়? হয়ত কিছুই বোঝা যায় না! সাধারণ মানুষে এ-দু'টো থেকে কিছুই বুঝবে না নিশ্চয়ই। অনিতাও পূরোপূরি কিছুই বোঝে নি, কিন্তু না-বুঝেও সে পিছিয়ে দাঁড়াল।

এক পা—এক পা ক'রে পিছোতেই থাকল সে। অবশেষে পিছিয়ে এসে দাঁড়াল অবিনাশের ষ্টেশনারি দোকানের সামনে। অবিনাশ অনিতার পাশের বাড়ীর ছেলে। দেখেই জিজ্ঞেস করলে—"কিছু চাই না কি, দিদি?"

"হ্যাঁ ভাই, দু'টো লোহার চুলের কাঁটা দাও ত'।"

কাঁটা বাছাই করতে করতে আড়চোখে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল অনিতা। সিংজী স্টার্ট দিতে গিয়ে ফিরে এল; হোটেলের ক্যাশিয়ারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়াতে লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে। কিন্তু কই, টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়ার সময় সে ত' বিলের কথা ভাবে নি! কিংবা ক্যাশিয়ারও ত' তার পিছনে হাঁকডাক করে নি—বিল আদায় করবার জন্য! ওদের ধারে কারবার চলে নিশ্চয়ই। কিংবা হয়ত নেড়ো আর চা-এর দাম সে আগে থাকতেই দিয়ে রেখেছিল! এখন হয়ত পাঁচ টাকার একটা নোট বার করছে, ভাঙ্গানি নেবার জন্য।

অর্থাৎ, অনিতা যতক্ষণ অবিনাশের দোকান থেকে না বেরুচ্ছে, ততক্ষণ ক্যাশিয়ারের সম্মুখ থেকে ছুটি নেই সিংজীরও।

একটা মতলব ওর আছে! নির্ঘাৎ আছে! কী সে মতলব, তা ঠাউরে নিতে চেষ্টা করল অনিতা। অনিতাকে ধরে তুলতে চায় মোটরে। বিনাপয়সায় বাড়ী পৌঁছে দেবার লোভ দেখিয়ে যে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। তা এবারে জোর ক'রে হাসিল করতে চায়। মোটরের দরজা খুলে একটা লোক আগে থেকেই ব'সে আছে—জানে যে ঐ দরজার পাশ দিয়ে ছাড়া অনিতার যাওয়ার উপায় নেই। ওত পেতে ব'সে আছে। যেমনি অনিতা দরজার পাশে আসবে, টেনে তুলে দেবে ছুট্! গাড়ীতে স্টার্ট দেবার জন্য ত' যাচ্ছিলই সিংজী!

সঙ্কট! কেন এ সঙ্কট, এর পেছনে কার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা চিন্তা করবার সময় এখন নয়। এখনকার কর্ত্তব্য হ'ল—নিরাপদে বাড়ী পৌঁছানো।

কাঁটা বাছাই করতে করতে সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে দু'চার কথা বলল অবিনাশকে।

পাড়ায় ব্যায়ামসমিতির নিয়মিত খেলোয়াড় অবিনাশ, তার চোখ লাল হয়ে উঠল সে-কথা শুনতে শুনতে। ভিতর দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ জোরগলায় হেঁকে উঠল—"হেবো, রেশমী সুতোগুলো দিদিকে দেখা ত'! আসুন দিদি, ভিতরে এসে দেখুন।"

আশপাশের দোকানীরা অবাক্ হয়ে তাকাল এদিকে। অবিনাশের দোকানে হেবো ব'লে কোন প্রাণীকে তারা ত' কোনদিন দেখেনি!

সে যাই হ'ক, অনিতা ততক্ষণে দোকানে ঢুকে পড়েছে—রেশমী সুতো বাছাই করবার জন্য।

অবিনাশ আবার হাঁক দিল—"ভাল ভাল রং দেখা হেবো! আমি আসছি একবার ওদিক থেকে!"

সোজা গিয়ে স্বরাজ হোটেলের ক্যাশিয়ারের সম্মুখে দাঁড়াল সে।—"এই উল্লু, তেরা গাড়ী হঠায়েগা কি নেই?"—হুঙ্কার ক'রে উঠল সিংজীর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে।

এক মুহূর্ত্ত সিংজী নীরব, যেন পাথরের মূর্ত্তি! তারপর "মুঝকো?"—ব'লে সে-ও ছাড়ল প্রতি হুঙ্কার; এবং শালের গুঁড়ির মত হাতখানা সট্ ক'রে বাড়িয়ে দিল অবিনাশের টুঁটি চেপে ধরবার জন্য।

লম্বা ছোরা বা'র করলে সিংজী। [পৃঃ ১৪০

কিন্তু দুশমনকে টুঁটি চেপে ধরবার সুযোগ দেবার জন্য চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবার ছেলে অবিনাশ নয়। সে বিদ্যুৎবেগে দু'পা পিছনে সরে গেল, এবং স্বরাজ হোটেলের টিনের চেয়ার একখানা দু'হাতে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল সিংজীর মাথায়। বেপরোয়া লোক হ'লেও, সিংজীটা হয়ত এতখানির জন্য তৈরী ছিল না; ভেতো বাঙ্গালী তাকে মেরে বসবে আচমকা—এটা তার কল্পনারই বাইরে ছিল নিশ্চয়;

ফলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন বুঝতে পারবার আগেই সেই চেয়ার এসে পড়ল তার মাথায়। সিংজীর মাথায় ছিল পাগড়ি। তাতে আঘাতের বেগ খানিকটা কমিয়ে দিলে বটে, কিন্তু তবু মাথা ফেটে মোটা ধারায় রক্ত ঝরতে লাগল।

"তব্ রে—" ব'লেই লম্বা ছোরা বা'র করলে সিংজী।

কিন্তু দু'ধারের দোকান থেকে দোকানীরা ততক্ষণে ছুটে বেরিয়েছে অবিনাশ-দা'র সাহায্যের জন্য! আর গাড়ী থেকে ছুটে নেমে এসেছে সেই দ্বিতীয় সিংজী, যে এ-যাবৎ চুপ ক'রে বসেছিল দরজা খুলে। লন্‌ড্রির ছিরু ভট্‌চাজ সবে পিছন থেকে এক-নম্বর সিংজীর ছোরা-সমেত ডা'ন-হাতটা চেপে ধরেছে, এমন সময় দুই-নম্বর সিংজী করলে পিস্তল ফায়ার। সত্যি কথা বলতে হবে, মানুষ ঘায়েল করবার মতলব তার ছিল না; আকাশ লক্ষ্য করেই সে আওয়াজ করেছিল। কিন্তু হ'লে হবে কি, পিস্তলের শব্দ শুনেই ক্ষেপে গেল অবিনাশের দল। পনেরো বিশ জনে মিলে ঘিরে ফেললে যুগল সিংজীকে, আর দু'চার জন ছোকরা গিয়ে গাড়ীটাতে দিলে স্টার্ট।

গাড়ী নিয়ে ছোকরারা পালিয়ে যায় না কি? ভয় পেয়ে দুই-নম্বর সিংজী এবার সত্যিই তাদের তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেল রমাই সাণ্ডেল, সোনার-বাংলা সেলুনের সেরা কারিগর। তারপরই একখানা টিনের চেয়ার এসে পড়ল দুই-নম্বর সিংজীর মাথার উপরে, সে টাল খেয়ে প'ড়ে গেল, পিস্তল হাতে নিয়ে।

দেখতে দেখতে সিংজীরা ধরা প'ড়ে গেল; তাদের শক্ত ক'রে গ্যাসপোষ্টের সঙ্গে বেঁধে ফেলল সবাই। ছিরু ভট্‌চাজ ছুটল থানায়, আর রমাইয়ের ফার্ষ্ট-এড্ দেবার জন্য ডাক্তার ডাকতে ছুটল অবিনাশ। গুলিটা কাঁধে লেগেছে রমাইয়ের, বাঁচে কি মরে—বলা যায় না। [ক্রমশঃ

জেনে রাখা ভাল

ইংরাজী বর্ণমালার মধ্যে E অক্ষরটির প্রচলন সবচেয়ে বেশি। E অক্ষরটি যেখানে হাজার বার ব্যবহার করা হয়, সেখানে T ব্যবহার করা হয় ৭৭০ বার, A ব্যবহার করা হয় ৭২৮ বার, I ৭০৪ বার, S ৬৮০ বার এবং অন্যান্য অক্ষরগুলো আরও কম বার ব্যবহার করা হয়।

শুকতারার কবি
চলে গেছে শুকতারার দেশে

কাল যে সকলের সঙ্গে উৎসব করেছে, আনন্দ করেছে, একসঙ্গে বসে খেয়েছে—সম্পূর্ণ ও সুস্থ···

আজ সে চলে গেল···অকস্মাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে···এই পৃথিবী ছেড়ে!

এ মৃত্যুকে, এ বিচ্ছেদকে প্রিয়জনেরা কি করে সইবে?

এমনি অকস্মাৎ ভাবে খবর পেলুম, সুনির্ম্মল বসু নেই!

শুকতারার জন্যে যিনি লেখা আনতে গিয়েছিলেন, লেখার বদলে তিনি নিয়ে এলেন তাঁর মৃত্যু-সংবাদ। শুকতারার কবি চলে গিয়েছে শুকতারার দেশে! শুকতারার আসরে, বন্ধু-সম্মেলনের দিনে, চিরকালের মতন একটা আসন শূন্য পড়ে রইলো, শূন্য পড়ে রইলো বন্ধুর অন্তরে একটি আসন, যে-আসনে আর বসবে না কেউ!

বাংলা-সাহিত্যে শূন্য পড়ে রইলো একটা আসন, যে-আসনে বসবার অধিকারী আজকের সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ নেই···অন্তরে যে চিরশিশু নয়, শিশু-কবি সে নয়···মহাকবির মতন ভগবানের আশীর্ব্বাদ নিয়েই সে জন্মায়, পাঠশালায় তাকে তৈরী করা যায় না।

তার মন আলাদা, তার দৃষ্টি আলাদা, তার হাসি আলাদা, তার সাধনা আলাদা,—ভগবান যার ওপর ভার দেন শিশুদের মন-ভোলাবার, মন-দোলাবার, শিশু-মনকে আনন্দ দেবার! সুনির্ম্মল পেয়েছিলেন সেই ভার, কিশোর-কাল থেকে মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি বাংলাদেশের শিশুদের মন ভুলিয়ে রেখেছিলেন, ছন্দে সুরে দুলিয়ে গিয়েছেন তাদের আনন্দের নাগর-দোলায়।

যেখানে কোন শিশু আনন্দে নেচে উঠবে, যেখানে কোন কিশোর বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে, যেখানে হাত-ধরাধরি করে ভাই-বোনে নাচের তালে ছড়া গাইবে, আমি জানি শিশুর মুখের সেই হাসিতে, সেই সরল চোখের সহজ চাউনিতে, সেই মুখে-মুখে ছড়িয়ে-পড়া ছড়ার নাচুনিতে বেঁচে থাকবে সুনির্ম্মলেরই হাসি, সুনির্ম্মলেরই চাউনি, সুনির্ম্মলেরই ছন্দ-সুর!

বাংলার শিশুদের কবি আজ এক দেহ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার দেহে, ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার শিশুদের নাচ-গান-হাসি-হল্লায়।

সেখানে কে দুঃখ করবে তার জন্যে ?

কিন্তু সন্ধ্যায় পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ যখন মনে পড়বে, সে-বন্ধু তো আর আসবে না…সে সদানন্দ মুখ তো আর চোখে পড়বে না…বন্ধু-মিলনের দিনে আর তো শোনা যাবে না তার হাসি…তখন, হে ভগবান, অশ্রু-বর্ষণে কি শান্ত হবে মন ?

সাবাস এ, সি, সরকার *

—সুনির্ম্মল বসু

সাবাস এ, সি, সরকার ভাই—
করলে বাজীমাৎ,
তুর্কী-নাচন নাচিয়ে সবায়
করলে কুপোকাৎ।
গলায় বাজাও, গীটার-শানাই—
হরেক যাদু তোমার জানাই।
অসম্ভবের ভেলকি তোমার
দেখালে নির্ঘাৎ।
দেশ-বিদেশের গুণীর সভার,
'চক্ষুচড়ক' করলে সবার—
ইয়োরোপের তামাম জনে
ধরালে মৌতাত্,
বিস্ময়েতে বিশ্ব মাতাও
কেয়াবাৎ-কেয়াবাৎ।

---

* ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে স্বীয় যাদু-নৈপুণ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া যাদুকর এ, সি, সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পরে কবি এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠান।

—শ্রীমধুসূদন মজুমদার

বিষবৃক্ষ

ভারতের বুকে দুঃস্বপ্নের মত একদিন দেখা দিয়েছিল ইংরেজ······ রাজনীতিতে চতুর, দুঃসাহসিক কার্য্যে পটু ইংরেজ······

সেও শোনে সোনার দেশ ভারতের কথা······

গ'ড়ে ওঠে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান—নাম হ'ল তার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সনদ নিয়ে ঝাঁপ দেয় তারা সাগরের বুকে ···ভাগ্যলক্ষীর অন্বেষণে···এসে পৌঁছায় ভারতের কূলে—পর্ত্তুগীজদের পিছনে পিছনে······

দিল্লীর দরবার—সিংহাসনে আসীন জাহাঙ্গীর।

প্রতিপদক্ষেপে কুর্ণিশ করতে করতে এসে দাঁড়ায় স্যার টমাস রো—কোম্পানীর পক্ষ থেকে। প্রার্থনা—সোনার দেশ ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সামান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করা।

উদারপ্রকৃতি সম্রাট মঞ্জুর করেন বিদেশী দূতের অভিলাষ।

সেদিন জাহাঙ্গীর কল্পনাও করতে পারেন নি, তাঁর এই কাজের দ্বারা যে বিষময় বীজ উপ্ত হ'ল, তা' একদিন মহীরুহের রূপ নিয়ে দেশমাতার বক্ষ থেকে রক্ত নেবে নিংড়ে।

চতুর ইংরেজ ভাবলে নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রতে হ'লে দরকার বাসস্থান—দরকার থাকবার ঘাঁটি—দরকার অস্ত্র-শস্ত্র।

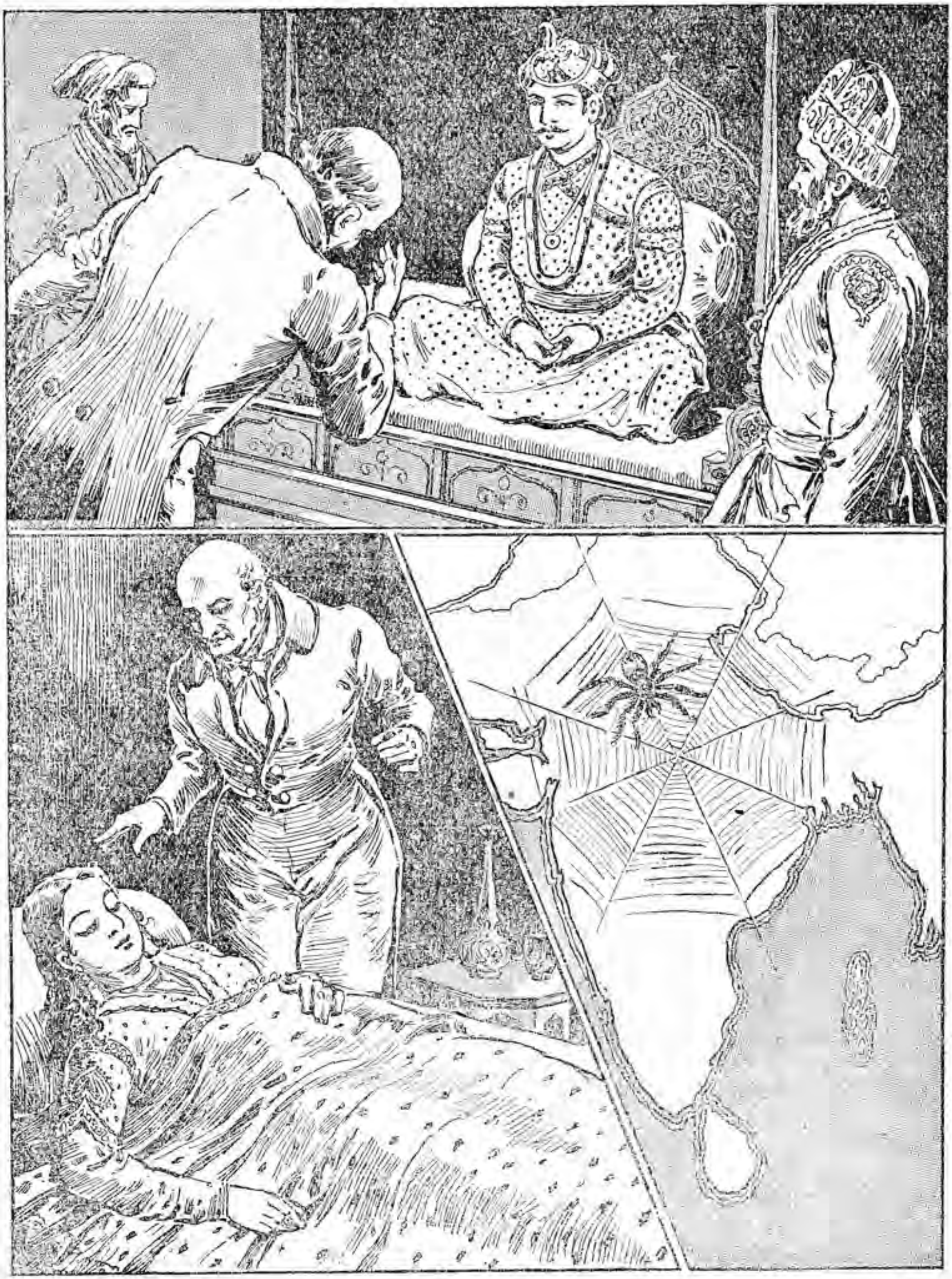

১নং চিত্র। কুর্ণিশ করতে করতে এসে দাঁড়ায় স্যার টমাস রো।
২নং চিত্র। ইংরেজ চিকিৎসক সাহায্য করল শাহ্‌জাদীর রোগ-নিবারণে।
৩নং চিত্র। প্রসারিত শাখা-প্রশাখা আচ্ছন্ন করল ভারতকে—মাকড়সার জালের মত।

নানাভাবে তারা বাদশাহের মনকে করতে চাইল তুষ্ট।

জাহাঙ্গীরের কন্যা অসুস্থ। ইংরেজ চিকিৎসক সাহায্য করল শাহ্জাদীর রোগ-নিবারণে।

খুশী জাহাঙ্গীর কুঠি নির্ম্মাণ ক'রে অবাধ ব্যবসা করতে দিলেন ইংরেজকে।

বিষবৃক্ষের মূল ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হ'তে লাগল ভারতমাতার মাটিতে।

ইংরেজ কুঠি নির্ম্মাণ করে প্রথমে সুরাটে—তারপর চোরমণ্ডলে জমি কিনে পত্তন করে মাদ্রাজ শহর।

পর্ত্তুগালের রাজকুমারীকে বিবাহ করায় ইংলণ্ডের রাজা চার্লস যৌতুক পান বোম্বাই—ফলে বোম্বাই শহরও এল ইংরেজের হাতে।

সুদূর পূর্ব্বে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা দেশে কয়েকটা গ্রাম কিনে কলিকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করল ইংরেজ।

দস্যু-তস্করের হাত থেকে আত্মরক্ষার ছুতা তুলে তাদের কুঠিগুলিকে রূপ দিল দুর্গে···ভর্ত্তি করল সেগুলি তাদেরই দেশের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে।

ঔরঙ্গজেব মৃত—দেশের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা···যে যাকে পারে তাকে করে আক্রমণ···দেশের শাসন-রজ্জু ধূলায় লুণ্ঠিত···

আমীর-ওমরাহদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব······সকলেরই লক্ষ্য দিল্লীর তক্ত-তাউস!

চতুর ইংরেজ এ সুযোগ ছাড়ল না।

ভারত পাবার ছবি ফুটে উঠল তাদের চোখের সামনে।

পিছনে থেকে কৌশলী ইংরেজ হাসতে হাসতে তৈরি করতে লাগল নিজেকে।

বিষবৃক্ষের মূল হ'ল সুদৃঢ়—প্রসারিত শাখা-প্রশাখা আচ্ছন্ন করল ভারতকে—মাকড়সার জালের মত!

[ক্রমশঃ

মাতৃস্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

শহীদ

—অসীমকুমার রায়

প্রথম দৃশ্য

[অশোকের ঘর। দেওয়াল ঘেঁসিয়া লম্বালম্বিভাবে একটি ছোট খাট। খাটে পরিপাটি বিছানা পাতা। পাশে আড়াআড়িভাবে একটি ছোট টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের উপর টেবিলল্যাম্প জ্বলিতেছে ও কয়েকখানি বইখাতা অগোছাল ভাবে স্তূপীকৃত করা। একখানি বই খোলা—যেন কেহ এইমাত্র পড়িতে পড়িতে উঠিয়া গিয়াছে। খাটের মাথার দিকে একটি বইয়ের র‍্যাক—তাহাতে বই-খাতা সাজান। উপরের তাকে একটি এলার্ম-টাইমপিস ঘড়ি। তাহাতে সময় দেখা যাইতেছে—রাত্রি আটটা চল্লিশ মিনিট। ঘরের দেয়ালে একখানি সরস্বতীর পট। তাহার উপর একটি শুকনো ফুলের মালা ঝুলিতেছে। হন্তদন্ত হইয়া অশোক প্রবেশ করিতেছে দেখা গেল। ছেলেটির বয়স প্রায় ১৩।১৪ বৎসর। বেশ সপ্রতিভ চেহারা, কিন্তু মুখ বিষণ্ণ। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, পরনে হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট। সার্টের বোতাম সব খোলা।]

অশোক—(ব্যস্তসমস্তভাবে চেয়ারে বসিতে গিয়া ঘড়ির দিকে চোখ পড়িতেই—)

ওরে বাস্‌রে! আটটা চল্লিশ! কতখানি সময় নষ্ট হয়ে গেল। কি যে করি! কাল ইতিহাস একজামিন অথচ এখনও পর্য্যন্ত একটা কোশ্চেনও ভাল ক'রে মুখস্থ হ'ল না। এবার নির্ঘাত ফেল হয়ে যাব। (কপালে ভক্তি-ভরে জোড়হাত ঠেকাইয়া ও চোখ বুজিয়া) হে মা কালী! না না—হে মা সরস্বতী অপরাধ নিও না মা। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মা। সত্যি বলছি এবার থেকে খুব কম ক'রে আড্ডা দোব—এবারকার মত কোনরকমে ইতিহাসে তিরিশটা নম্বর পাইয়ে দে মা! আমি বাজারের পয়সা থেকে সরিয়ে সিনেমা দেখবার জন্যে যা জমিয়েছি তা থেকে গোটা একটা আধুলি তোর নামে পুজো দোব মা—হেই মা দয়া কর্ মা—

(তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল)

এই যে এইখানটাই পড়ি। মাষ্টারমশাই বারবার বলেছেন এখান থেকে একটা কোশ্চেন সিওর আসবে—

(জোরে সুর করিয়া পড়িতে লাগিল)

"১৮৫৭ সালে দেশময় সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিল। দেশবাসীর স্বপ্ন সফল হইল……" ···১৮৫৭ সালে···ইত্যাদি।

(খানিক পরে)

দেখি মুখস্থ হ'ল নাকি—(চোখ বুজিয়া) ১৮৪৭ সালে···না না ১৯৪৭ সালের একশত বৎসর পর···দূর ছাই কিচ্ছু মনে থাকছে না। কি ফ্যাসাদেই যে পড়লাম! যত গোলমেলে কাণ্ডকারখানা। অত সাল তারিখের কি দরকার রে বাবা! সোজাসুজি ব'লে গেলাম হয়ে গেল—তা' না—যত ঝামেলা!

(আবার পড়িতে লাগিল)

"১৮৫৭ সালে দেশময় সিপাহী বিদ্রোহের

আগুন জ্বলিয়া উঠিল—১৮৫৭ সালে—১৮৫৭ সালে……” আর স্যাররাও হয়েছে তেমনি। ইতিহাসটা প্রথম দিনেই দেবার কি দরকার ছিল রে বাবা! সোমবার দিলে কি এমন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে যেত? তা’ কেন দেবে? তাহলে যে শনি-রবি দু’টো দিন পড়তে পেতুম! শত্তুর—শত্তুর! সব্বাই মিলে পেছনে লেগেছে।

(পড়িতে লাগিল)

[ক্রমশঃ পড়ার সুর মৃদু হইতে লাগিল—দেখা গেল অশোক পড়িতে পড়িতে ঢুলিতেছে। পড়াও উল্‌টাপাল্‌টা হইয়া যাইতেছে।]

১৮৪৭ সালের—১৫ই আগষ্ট দেশময়—আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহার—একশত বৎসর পর—বৃটিশপ্রভুত্বের স্বপ্ন সফল হইল।

[অশোকের বাবা প্রবেশ করিলেন। বেশ গোলগাল চেহারা। ভারিক্কী মেজাজ। পরনে ধুতি, গায়ে কোট, পায়ে জুতা।]

অশোকের বাবা—অস্কা! হতভাগা এই সন্ধ্যেরাত্রে ব’সে ব’সে ঘুমোচ্ছিস যে বড়? কাল না তোর পরীক্ষা?

অশোক—(চমকাইয়া) কই না ঘুমোইনি তো! আমি তো পড়ছি! ১৮৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশময় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৮৪৭ সালের…

অশোকের বাবা—চমৎকার! এমন না হলে পরীক্ষার পড়া! বাঁদর কোথাকার—কি পড়ছে তার মাথামুণ্ডু নেই। আবার বলা হচ্ছে ঘুমোই নি! ভাল চাস্ তো রাতজেগে পড় মন দিয়ে। মনে থাকে যেন পরীক্ষায় ফেল করলে বাড়ী থেকে দূর ক’রে দোব। (বাহিরে যাইতে যাইতে) একবার উঠে সদর দরজাটা বন্ধ ক’রে দে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

অশোক—একটু যে মন দিয়ে পড়ব তার যো নেই। খালি “অস্কা! মেরে হাড়গুঁড়ো ক’রে দোব।” “অস্কা! বাড়ী থেকে দূর ক’রে দোব” —উঃ আমি যেন রাস্তার কুকুর-বেড়াল!

(ঘুমজড়িত কণ্ঠে পড়িতে লাগিল)

“১৮৫৭ সালে—১৮৫৭ সালে দেশময় সিপাহী বিদ্রোহ—১৮৫৭ সালে—” ইস্ কি ঘুম পাচ্ছে রে বাবা। মা’কে অত ক’রে বললুম এখন খাব না—তা’ হ’ল না—এখন কি করি? চোখ যে খুলে রাখতে পারছি না! (হাই তুলিল)

[আবার পড়িতে পড়িতে-ঢুলিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার মাথা নীচু হইতে হইতে টেবিলের উপর ঠেকিয়া গেল। দেখা গেল অশোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরীক্ষার হল। ১০।১২ জন ছেলে একমনে লিখিতেছে। অশোককে সামনেই দেখা যাইতেছে। সে গালে হাত দিয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। একজন গার্ড (ইন্‌ভিজিলেটর) তাহার পাশ দিয়া পায়চারি করিতে করিতে একদিকে চলিয়া গেলেন।]

অশোক—(এদিক ওদিক তাকাইয়া পাশের ছেলের প্রতি মৃদুস্বরে) এই সতু! চার-এর কোশ্চেনটা একটু দেখা মাইরী। আমি খুব তাড়াতাড়ি টুকে নোব। দেখা ভাই! উঃ এত ক’রে বলছি—তোর দু’টি পায়ে পড়ি—দেখা! আমি কিচ্ছু লিখতে পারছি না।

সতু—আমি যে লিখছি—লিখতে লিখতে কি ক’রে দেখাব বল্?

অশোক—একবার ক'রে পাতাটা তুলে ধর না —আমি টুকে নিচ্ছি।

[নেপথ্যে ইন্‌ভিজিলেটর-এর গলা শোনা গেল—"নো টক্‌স প্লিজ—কথা বলবে না।" অশোক তাড়াতাড়ি নিজের খাতায় মনোনিবেশ করিল। ইন্‌ভিজিলেটর আবার পায়চারী করিতে করিতে অশোকের পিছন দিকে চলিয়া গেলেন। অশোক খানিকপরে চারিদিকে চাহিয়া জামার নীচে হইতে সন্তর্পণে কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া খাতার নীচে রাখিয়া একমনে টুকিতে লাগিল। পিছন হইতে ইন্‌ভিজিলেটর লক্ষ্য করিতেছেন—দেখিতে পাইল না।]

ইন্‌ভিজিলেটর—ইউ দেয়ার্—(সামনে আসিয়া) দেখি তোমার খাতাটা।

অশোক—(ঢোঁক গিলিয়া) আমাকে বলছেন স্যার ?

ইনভি—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। খাতার নীচের কাগজগুলো কি দেখি।

অশোক—(তোত্‌লাইয়া) কই—কি—কি—ছু নে—নে—ই তো স্যার !

ইনভি—(কাগজ বাহির করিয়া) এগুলো তাহলে কিছু না—কেমন ? (গম্ভীর স্বরে) কাম উইথ্ মি। উঠে এস আমার সঙ্গে।

অশোক—এবারের মত ছেড়ে দিন স্যার—আর কক্ষণো—

ইনভি—সবাই তাই ব'লে থাকে। চ'লে এস। হেডমাষ্টার ম'শায়ের কাছে যেতে হবে তোমাকে। এস—

[খাতাপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। অশোক নতমুখে ধীরে ধীরে তাহার পিছন পিছন চলিয়া গেল।]

সতু—(পাশের ছেলের প্রতি) এক্‌স্‌পেল করে দেবে বোধ হয়—নারে ?

পাশের ছেলে—তা আর বল্‌তে—হেড-মাষ্টারের কোন দয়ামায়া নেই—পাষাণ !

(আবার সকলে একমনে লিখিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[খেলার মাঠ। ৪।৫টি ছেলে বসিয়া পরামর্শ করিতেছে। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। অশোককেও দেখা যাইতেছে। সময় অপরাহ্ণ।]

অশোক—উঃ ! অত করে বললুম, স্যার আর করবো না, এবারের মত মাফ করুন তা কথাটা কানেই তুল্‌ল না। একেবারে এক্‌স্‌পেল ক'রে দিল। কি এমন অপরাধ করলুম রে বাবা ? মানলুম টুকতে যাচ্ছিলুম—সত্যি তো আর টুকিনি তখনও পর্য্যন্ত।

১ম বালক—আর বলিস্ না ভাই। স্যারদের জুলুম দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে।

২য় বালক—আমি দোষের মধ্যে গলাটা একটু বাড়িয়ে পাঁচুর খাতা থেকে দু'টো লাইন দেখেছি কি দেখিনি—ব্যাটা এসে ক্যাঁক্ ক'রে ধরল পেছন থেকে। শকুনিমামা কি আর সাধে বলি ?

৩য় বালক—সকলেরই তো এক দশা। তা' এখন কি করবি তাই বল। ডেকে তো নিয়ে এলি পরামর্শ আছে বলে।

অশোক—উপায় তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এদিকে বাবা তো শাসিয়ে রেখেছে, ফেল করলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

২য় বালক—তোকে তো শুধু তাড়িয়ে দেবে। আর আমার মামাটি যে কি চিজ্ তা তো জানিস্ না ! গুণ্ডা একটা। আগে উত্তম মধ্যম দিয়ে আধমরা ক'রে দেবে তারপর ঘাড়ে ধ'রে বিদেয় করবে। কি যে করি ?

১ম বালক—এ অপমান আর সহ্য হয় না ভাই। এর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে বনে বাস করা ভাল।

৩য় বালক—তার চেয়ে চল্ না আত্মহত্যা করি সবাই মিলে।

২য় বালক—দূর্, আত্মহত্যা-টত্যাতে কাজ হবে না; সবাই বলবে আপদ গেছে। এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে সকলের চেতনা হয়, যে হ্যাঁ আমরাও মানুষ—কুকুর-বেড়াল নই!

অশোক—তোরা একটু চুপ করবি? আমাকে একটু ভাবতে দে। একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।

(মাথার চুল থাম্চাইয়া বসিয়া রহিল)

অশোক—হয়েছে। ইউরেকা!

সকলে—কি হল আবার?

অশোক—ক'দিন বাদেই তো রেজাল্ট বেরুবে। যে সব ছেলে ফেল করবে তাদের নিয়ে একটা দল করলে কেমন হয়? মাষ্টার-ম'শায়রা তো একজন আধজনের কথা শুনবেন না—কিন্তু সবাই মিলে আমরা যদি একটা আন্দোলন করি, তা'হলে—

সকলে—(উৎসাহিত হইয়া) খুব ভাল হয়।

অশোক—তা'হলে নিশ্চয়ই ফল হবে। আমাদের দাবীগুলো তাঁরা মানতে বাধ্য হবেন।

১ম বালক—যদি না মানেন?

অশোক—তা'হলে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা সফল না হব ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমাদের প্রতি তাঁদের এই নির্লজ্জ ও অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাব, আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে তাঁদের অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াব।

সকলে—হিয়ার্ হিয়ার্!

অশোক—এখন আমাদের সংঘের কি নাম দেওয়া যায় বল দেখি? প্রেসিডেণ্ট-টেসিডেণ্ট-গুলোও ঠিক ক'রে ফেলা দরকার।

২য় বালক—তুই-ই প্রেসিডেণ্ট হ' না!

অশোক—তা না হয় হলুম। তা'হলে তুই আর ভূতো জয়েণ্ট-সেক্রেটারী হ'। আর পটলা অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী হ'ক—কেমন?

৩য় বালক—আচ্ছা সংঘের নাম হোক্ না—"পাটুলিপুর হাইস্কুল প্লাক্‌ড্-ষ্টুডেণ্ট্‌স্ ইউনিয়ন—পাটুলিপুর হাইস্কুলের ফেল-করা ছাত্র-সংঘ"।

সকলে—হ্যাঁ-হ্যাঁ বেশ বলেছিস্। তাই হোক—তাই হোক।

অশোক—আচ্ছা এখন চল সবাই। সন্ধ্যে হয়ে গেল। [সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[খেলার মাঠ। বেশ কতকগুলি ছেলে একজায়গায় বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের কাহারও কাহারও হাতে ছোট ছোট পোষ্টার লাগান নিশান, ফেষ্টুন প্রভৃতি। কয়েকটি পোষ্টার দেখা যাইতেছে—তাহাতে লাল-কাল হরফে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—"দমননীতি বন্ধ কর", "আমাদের দাবী মানতে হবে", "গার্ডেদের জুলুম চলবে না", "অভিভাবকদের অত্যাচার সহ্য করব না" ইত্যাদি। অশোক দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছে। তাহার গলায় একটা গাঁদা-ফুলের মালা। পিছনে লাল ফেষ্টুনে কাল হরফে লেখা আছে—"পাটুলিপুর হাইস্কুলের ফেল করা ছাত্র-সংঘ"।

(পর্দ্দা উঠিতে উঠিতে বক্তৃতা শোনা গেল)

অশোক—(উত্তেজিতভাবে হাত নাড়িয়া)··· তাই বলি বন্ধুগণ,—উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ—আপনারা উঠুন, জাগুন! বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে চলুন। অভিভাবক আর শিক্ষকদের জানিয়ে দিন, দমননীতির যুগ আর নেই। পরীক্ষার হলে

অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য শাস্তিবিধান করা আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করব না। দিনের পর দিন—বছরের পর বছর—হাজার হাজার ছাত্রকে ফেল করান আমরা আর কোনমতেই সহ্য করব না। আমরা এখন স্বাধীন ভারতের সন্তান। ছাত্র-জীবনে যদি এই সামান্য স্বাধীনতাটুকু আমরা না ভোগ করতে পারি তাহ'লে আর ভারত স্বাধীন কিসে! আপনারা সকলেই জানেন বন্ধুগণ—অভিভাবকদের আর শিক্ষকদের অত্যাচার আজ চরমে উঠেছে। তারা বলে, "ফেল করলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দোব।" তারা সামান্য পরীক্ষার খাতায় টোকার অপরাধে পরীক্ষার হল থেকে বের ক'রে দিতে ভয় পায় না—

সকলে—শেম-শেম।

অশোক—তাই আজ আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে চরম আঘাত হানবার জন্যে আমরা তৈরী হয়েছি। এক মহান্ কাজে ব্রতী হবার জন্যে আমাদের আজ ডাক এসেছে। এই জঘন্য, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন অত্যাচারের—অবিচারের—অন্যায় ব্যবহারের উপযুক্ত উত্তর দেবার জন্যে আপনারা কি আজ সে ডাকে সাড়া দেবেন না?

সকলে—নিশ্চয়ই দোব, নিশ্চয়ই দোব।

অশোক—তবে চলুন সকলে। আমাদের দুর্ব্বার শক্তির প্রচণ্ড আঘাত হেনে আমরা আজ আমাদের সম্মুখের সমস্ত বাধা চূর্ণ করে দিই। পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের এই অহিংস অভিনব সংগ্রামের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক। বলুন সবাই—"বন্দে মাতরম্"—"ই ন কি লা ব জিন্দাবাদ"।

সকলে—"ব ন্দে মা ত র ম্", "ই ন কি লা ব জিন্দাবাদ"।

অশোক—এখন আপনারা প্রস্তুত হয়ে নিন। আমাদের অভিযান আরম্ভ হবে। স্কুলের ফটক আজ আমাদের ডিঙ্গোতেই হবে। কোন বাধাই আমরা মানব না। দরকার হ'লে মরণকেও আমরা বরণ ক'রে নোব। আমরা হব শহীদ—আমরা হ'ব ইন্‌সান। আপনারা সকলে প্রতিজ্ঞা করুন, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"।

সকলে—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

[নানারূপ শ্লোগান দিতে দিতে অশোকের পিছনে পিছনে সকলের প্রস্থান শ্লোগান শোনা গেল—বন্দে মাতরম্, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আমাদের দাবী মানতে হবে, গার্ডদের জুলুম বন্ধ কর, অভিভাবকদের নির্দ্দেশ মানব না, ফেল করাদের পাশ করাও, ইত্যাদি।]

পঞ্চম দৃশ্য

[অদূরে স্কুলের গেট দেখা যাইতেছে। ৮।১০ জন শিক্ষক লাইন করিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া আছেন। হেডমাষ্টার মহাশয় উত্তেজিত অবস্থায় পায়চারি করিতেছেন। তাঁহার হাতে মোটা একগাছা বেত।]

হেডমাষ্টার—মনে রাখবেন একটা ছেলেও যেন পেরুতে না পারে। চেষ্টা করলেই প্রহার সুরু করবেন। বেত, কিল, চড়, কানমলা কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই। আর হ্যাঁ, "অস্কা"—ঐ দলের পাণ্ডাটার ভার আমি নিজে নিলাম।

(গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন)

[দূরে মিছিলের কলরব ও শ্লোগান শোনা গেল। ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে বোঝা যাইতেছে।]

ঐ ওরা এসে পড়েছে। সাবধান সবাই। রাস্তাটা বেশ ভাল ক'রে ঘিরে থাকুন, কেউ যেন এক পা-ও এগুতে না পারে।

[সামনে অশোক, পিছনে সারি দিয়া দলটি শ্লোগান দিতে দিতে প্রবেশ করিল। শ্লোগান পূর্ব্ববৎ।]

হেডমাষ্টার—খবরদার, আর এক পা-ও কেউ সামনে এগুবে না।

অশোক—(ছেলেদের দিকে ফিরিয়া) ...বন্ধুগণ! সামনে প্রচণ্ড বাধা—কিন্তু আমাদের তা অতিক্রম করতেই হবে। বুকে সাহস আর মনে বল নিয়ে সবাই এগিয়ে চলুন! বলুন—"ইনকিলাব জিন্দাবাদ

সকলে—"ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"

[সকলে সামনে যাইবার চেষ্টা করিতেই শিক্ষকগণ প্রহার সুরু করিলেন। ভীষণ হট্টগোলের মধ্যে—"ইনকিলাব জিন্দাবাদ" —"জুলুম"—"বাপ্‌রে মরে গেলাম"—"উঃ আঃ"—"আর করব না স্যার", ইত্যাদি শোনা যাইতে লাগিল।]

অশোক—(চীৎকার করিয়া) সবাই ব'সে পড়ুন—ব'সে পড়ুন।

হেডমাষ্টার—দাঁড়াও ষ্টুপিড্‌। ব'সে পড়াচ্ছি তোমাকে। পালের গোদা কোথাকার।

(বেত আস্ফালন করিলেন)

অশোক—"ইনকিলাব জিন্দাবাদ"। "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"।

হেডমাষ্টার—তবে তাই, মর (মাথায় বেত দিয়া আঘাত করিলেন)।

অশোক—(মাথায় হাত দিয়া) উঃ মাগো; ভগবান। (পড়িয়া গেল)

[রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল।]

[আলো জ্বলিতেই প্রথম দৃশ্য পুনরায় দেখা গেল। অশোকের ঘর। সে টেবিলে মাথা দিয়া তখনও ঘুমাইতেছে আর ঘুমের ঘোরে মাথায় একটা হাত দিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে। তাহার বাবা পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার কান ধরিয়া টানিতেছেন। টাইমপিসে সময় দেখা যাইতেছে রাত্রি ন'টা দশ মিনিট।]

অশোক—উঃ মাগো! ভগবান। একটু জল। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

অশোকের বাবা—আ-মোলো যা! কি বক্‌ছে দেখ যা-তা ঘুমের ঘোরে। এই ষ্টুপিড ফের যে ঘুমোচ্ছিস—এই না মানা ক'রে গেলাম। অত জোরে মাথায় গাঁট্টা মারলুম একটা, তাও বাবুর ঘুম ভাঙ্গল না। (কান টানিয়া) এই হতভাগা—

অশোক—(ধড়মড় করিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ কি —আমি কোথায়?

(সামনে বাবাকে দেখিয়া ও চারিদিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেল)

অশোকের বাবা—কি দেখ্‌ছিস কি হাঁ ক'রে? ব'লে গেলাম দরজাটা বন্ধ ক'রে দিস্‌। তাও খোলা প'ড়ে ছিল। যদি সব চুরি হয়ে যেত? যা এখন খুব পড়া হয়েছে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়গে যা। ঘড়িটায় বরং এলার্ম দিয়ে রাখ ভোরে উঠে পড়বি।

[ভিতরে চলিয়া গেলেন]

অশোক—(উঠিয়া ঘ'ড়িতে দম দিতে দিতে) যাচ্চলে এতক্ষণ তাহলে যা হ'ল সবই স্বপ্ন!

—যবনিকা—

মাতৃস্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

ঠাকুরের দুগ্ধপান

—শ্রীদিলীপকুমার শীল

আমি আজ যে মহাপুরুষের জীবনের একটি ঘটনা তোমাদের কাছে বলিতেছি তাঁর নাম অনেকেই জানে।

শান্তিপুর গ্রাম। কৃষ্ণমণি দেবী মন্দিরে গিয়াছেন শ্যামসুন্দর দর্শন করিতে। দর্শনান্তে তিনি গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল যেন বিগ্রহমূর্ত্তি হইতে বাহির হইয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ বালক তাঁহার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। কৃষ্ণমণি দেবীর সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ বহিয়া গেল। তিনি ভাল করিয়া সেই শিশুটিকে দেখিবার জন্য চোখ ফিরাইলেন, তখন কিন্তু আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিস্মিত হইলেন কৃষ্ণমণি; তারপর তিনি নিজের দেখিবার ভুল মনে করিয়া চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে রওনা হইলেন।

গভীর রজনী। কৃষ্ণমণি দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি দেখিলেন সেই হাস্যবদন কৃষ্ণবর্ণ বালক। মৃদু হাস্যমুখে বালক বলিল, "জননীগো আমি তোমার নিকট থাকব। একথার অর্থ তুমি পরে বুঝবে।"

আর এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই কৃষ্ণমণি দেবীর গর্ভে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীরূপী শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন।

বাল্যকালে বিজয়ের দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না, লোকে তাহার জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। কখন যে কি করিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। কৃষ্ণমণি দেবীকেও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান থাকিতে হইত।

শৈশবের একটি ঘটনা।

বিজয়কৃষ্ণ প্রত্যেক লোককেই যাহা করিতে দেখিতেন, নিজেও তাহাই করিতে চাহিতেন। মায়েরা যে আদর করিয়া তাঁহাদের শিশুকে কোলে করিয়া দুধ খাওয়ান তাহা দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণেরও ঐরূপ করিবার প্রবল বাসনা জন্মে। তাই একদিন তিনি মায়ের নিকট আব্দার ধরিলেন—ঠাকুরকে নিজ হাতে দুধ খাওয়াইবেন। মা তাঁহাকে নানাভাবে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাছা, ঠাকুরতো মানুষের মত আহার করেন না।"

তখন বিজয়কৃষ্ণ মাতাকে বুঝাইতে লাগিলেন,—"তুমি কিছু জান না মা। আমি খাওয়ালে ঠাকুর নিশ্চয়ই খাবেন।"

মাতৃমন শঙ্কায় পূর্ণ হইল, কারণ, তিনি ভাবিলেন পুত্র কি করিতে কি করিয়া বসিবে। তখন তিনি কৌশল করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর জন্মাষ্টমীর আগে তো অন্নভোগ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না! জন্মাষ্টমীর দিন তিনি যখন একেবারে তোমার ছোট্ট ছেলে হবেন তখন তিনি তোমার দেওয়া ভোগ খাবেন।"

মায়ের কথায় বিজয় তখনকার মত শান্ত হইলেন এবং কবে জন্মাষ্টমী আসিবে তাহার দিন গুণিতে লাগিলেন।

জন্মাষ্টমী দিবস।

পূর্ব্বের সর্ত্তানুযায়ী বিজয়কৃষ্ণ আজ তাঁহার ঠাকুরকে খাওয়াইতে বসিয়াছেন নিজ হাতে। একবাটি দুগ্ধ ও একটি ঝিনুক লইয়া বিজয় ঠাকুরঘরে গেলেন। মা অন্তরালে থাকিয়া পুত্রের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরঘরে গিয়া বিজয় শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তিটিকে সযত্নে কোলে করিয়া বসিয়া বাটি হইতে দুধ ঝিনুকে লইয়া শ্যামসুন্দরের মুখে ঢালিয়া দিলেন। একি! ঠাকুর যে সত্যসত্যই দুধ পান করিলেন!! মাতার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ বহিয়া গেল। বালক আবার দুধ লইয়া ঠাকুরের মুখে 'টু, খাও' 'টু, খাও' করিয়া ঢালিয়া দিলেন। ঠাকুর সেই দুধ পান করিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে এই বিগ্রহমূর্ত্তি সত্য।

এবার আর মায়ের শরীরে শিহরণ বহিল না। এবার মায়ের চক্ষে দেখা দিল ভক্তির অশ্রু……।

জুবিলা (বর্দ্ধমান) হ'তে শ্রীআশীষকুমার মিত্র তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"পিতৃস্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে এক সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ঃ

কোন পিতৃভক্ত বালকের কাহিনী, পরের জন্য জীবন দান, স্বাস্থ্যই সুখের মূল অথবা **কোন বৈজ্ঞানিক গল্প।**

১। শুকতারার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন। ২। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে স্পষ্ট করে লিখতে হবে। রচনা শুকতারার ৪ পৃষ্ঠার বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩। খাম বা মোড়কের উপর **"পিতৃস্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"** এই কথাগুলো লিখতে হবে। ৪। চৈত্র-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত রচনা গৃহীত হবে। ৫। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা "শুকতারা" জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। ৬। শুকতারা কর্তৃপক্ষের বিচারই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। রচনার গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ৩৲ টাকা দামের বই।

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ—দেব সাহিত্য-কুটীরের প্রকাশিত ২৲ টাকা দামের বই।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, **শুকতারা,** ২১।১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

—শ্রীসাংবাদিক

রণজী ট্রফিতে বাংলার পরাজয়—এবারকার রণজী ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বাংলা সার্ভিসেসের কাছে হেরে গেছে।

রণজী ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতাই ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাটির নামকরণ করা হয় ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিং-এর নামে। তিনি ইংলণ্ডের হয়ে অনেক বড় বড় ম্যাচ খেলেছেন এবং প্রায় প্রত্যেক খেলাতেই ভাল ফল দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ইংলণ্ডের হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেষ্ট খেলাতে সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রায় সব কয়টি রাজ্যই যোগদান করে। প্রতিযোগিতাটিকে ভাল-ভাবে পরিচালনা করবার জন্য ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটি অঞ্চলের নাম—পূর্ব্ব অঞ্চল, পশ্চিম অঞ্চল, উত্তর অঞ্চল, দক্ষিণ অঞ্চল ও মধ্য অঞ্চল।

এই প্রতিযোগিতায় বাংলাকে প্রথমে খেলতে হয় আসামের সঙ্গে। খেলাটি হয় আসামের জোড়হাটে। এই খেলাটিতে বাংলা আসামকে এক ইনিংস ও ২০৬ রানে হারিয়ে দিয়েছে।

বাংলার স্পিন-বোলার প্রেমাংশু চ্যাটার্জ্জি ১ম ইনিংসে আসামের দশজন খেলোয়াড়কেই আউট ক'রে একটা রেকর্ডের সৃষ্টি করেছেন। এঁর আগে আর কোন বোলারকে এই রণজী ট্রফির খেলায় এক ইনিংসে ১০টি উইকেট আর পেতে হয়নি।

এতে অনেককেই বলতে শোনা গেছে যে, ভারী তো আসামের সঙ্গে খেলা, তার আবার ১০টি উইকেট নেওয়া—এ সকলেই পারে! কিন্তু তাহলে বলি—বেশতো, তাই যদি তবে আসামের মত আর কি কোন টীম ভারতে নেই? কই এতদিন তো কেউ ১০টি উইকেট পাননি!

আসামকে হারিয়ে বাংলাকে খেলতে হয় বিহারের সঙ্গে, এই খেলাটি হয় কলকাতার ইডেন উদ্যানে। খেলাটিতে বাংলাদল বিহারদলকেও এক ইনিংস আর ১৪৯ রানে হারিয়ে দেয়।

সত্যি বলতে কি, বিহারের কোন খেলোয়াড়ই বাংলার বিপক্ষে সুবিধে ক'রে উঠতে পারেননি। বাংলার দু'জন নামকরা খেলোয়াড় পুঁটু চৌধুরী আর বেণু দাশগুপ্তকে বিহারের হয়ে খেলতে দেখা গেছে। সুঁটে ব্যানার্জি, বিমল বোস ও সুধীর দাস প্রমুখ কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়ও ছিলেন। সেইজন্য দর্শকরা আশা করেছিল খেলাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হবে। কিন্তু তাঁদের একেবারে হতাশ হ'তে হয়েছে।

বিহার দল টসে জিতে বাংলাকে প্রথমে ব্যাট করতে সুযোগ দিলে কেন—তা' বোঝা গেল না। গোড়াতেই এই ভুলটি করে বিহার দলকে পরে আফসোস করতে হয়েছে।

যা' হোক, টস্ হয়ে যাবার পর আম্পায়াররা আর মাঠে নামেন না। কী ব্যাপার! খেলা কি হবে না? প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক পরে আম্পায়াররা মাঠে নামলেন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে আম্পায়ার নাকি বেশী হয়ে গেছল। ক্রিকেট খেলাতে আম্পায়ার তো লাগে দু'জন মাত্র; কিন্তু কর্তৃপক্ষেরা নিযুক্ত করেছেন তিনজন আম্পায়ারকে। আরও জানা গেল কোন এক বিশেষ ব্যক্তির অনুরোধ রাখতে গিয়ে নাকি কর্তৃপক্ষেরা এই অসুবিধায় পড়েছেন। এইরকম অসুবিধায় যাতে ভবিষ্যতে আর তাঁদের না পড়তে হয়, আশা করি তাঁরা সেদিকে নজর রাখবেন।

দু'ঘণ্টার পর বাংলা দল ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৩টি উইকেট হারিয়ে করলেন ১৮৭ রান। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের পর বাংলা দল ৩৫৬ রানের মাথায় সকলেই আউট হয়ে গেলেন। বাংলার হয়ে শিবাজী বসু ৮৫, পি সেন ৮১ ও পি রায় ৪২ রান করলেন। বি চন্দ ও ফাদকারও কিছু কিছু রান করলেন। এন চৌধুরী ৮৭ রানে পেলেন ৬টি উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের চা-পানের কিছু সময় আগে বিহার দল ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৫ উইকেটে মাত্র ৭৪ রান করলেন। বিহারের কোন ব্যাটসম্যানই সুবিধে করতে পারেননি।

তৃতীয় দিনে বিহার দল হয়ত ভালই খেলতে পারতেন। কিন্তু বিধি বাম, তা আর কী ক'রে হবে। রাত্রে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঠের পিচ তখন খোলা অবস্থাতেই ছিল, আগে থাকতে ঢাকা দেবার কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। ফলে পিচটা ভিজে নরম হয়ে গেল। অতএব তোমরা বুঝতেই পারছ যে, মাঠের পিচ যদি ভিজে থাকে, তা হ'লে অনেক অনেক ধুরন্ধর ব্যাটস-ম্যানকেই কাবু হ'তে হয়—আর এঁরা তো তাঁদের কাছে শিশু।

মাত্র ১২৪ রানে বিহার দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলো। ফলে বিহারকে ফলো অন করতে হলো। বিহার দল দ্বিতীয় ইনিংসেও মাত্র ৮৩ রানে সকলে আউট হয়ে গেলেন।

শেষ পর্য্যন্ত বাংলাদল বিহারকে এক ইনিংস ও ১৪৯ রানে হারিয়ে দিয়ে সার্ভিসেসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করল।

সার্ভিসেসের সঙ্গে বাংলার খেলাটিও হয় কলকাতার ইডেন উদ্যানে। এই খেলাটিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলার ১ম ইনিংস শেষ না হওয়াতে জয়-পরাজয় ঠিক করতে হয় টস ক'রে। বৃষ্টির জন্য খেলাটিতে মোট দু'দিনের ওপর সময় নষ্ট হয়েছিল।

১৯৪৫ সালে রণজী ট্রফি প্রতিযোগিতায় এই আইন পাশ হয় যে, খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোন না কোন পক্ষের ১ম ইনিংস শেষ না হয় অথবা উভয় পক্ষের ইনিংসের মোট রানসংখ্যা সমান হয় তা' হলে টসের দ্বারা তাদের জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হবে!

এর আগে এইভাবে খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি করতে হয়েছে পাঁচবার। প্রথমবার ১৯৪৬ সালে বোম্বাই ও বরোদার মধ্যে খেলার ইনিংস শেষ না হওয়ায় টসে নিষ্পত্তি করতে হয়। এতে বরোদা জয়ী হয়। দ্বিতীয়বার ১৯৪৬ সালে আবার বরোদা দক্ষিণ-পাঞ্জাবকে টসে হারায়। এবার উভয় পক্ষের রানসংখ্যা ছিল সমান। তৃতীয়বার ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ হারিয়ে দেয় হায়দ্রাবাদকে। সেই খেলাটিও বৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু টসটি খেলার পর মাঠে না হয়ে হয় কলকাতায়। চতুর্থবার ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ আর একবার টসে হারিয়ে দেয় মহীশূরকে। পঞ্চমবার ১৯৫৫ সালে দিল্লী হারায় সার্ভিসেসকে টসের দ্বারা।

যাই হোক, সার্ভিসেস টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে। তারা গোড়ার দিকে বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও তৃতীয় উইকেটে আত্মা সিং ও অধিকারী বেশ কিছু রান যোগ ক'রে দেন। দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের পরে ৩৯৯ রান ক'রে সার্ভিসেসের সকলে আউট হয়ে যান। আত্মা সিং ১২৬ রান করেন। আর যাঁরা বেশী রান করেন তাঁদের মধ্যে অধিকারীর ৭৪ ও মহিন্দর সিংয়ের ৫১ নট আউট উল্লেখযোগ্য।

তারপর বাংলার পঙ্কজ রায় ও শিবাজী বসু সুরু করেন তাঁদের ১ম ইনিংসের খেলা। দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলা এক উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান করেন। তৃতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য গোড়ার দিকে খেলা হয়নি। পরে দিনের শেষের দিকে বাংলাদল কিছুক্ষণ ঐ ভিজে মাঠে ব্যাট ক'রে ১ উইকেটে ১৬১ রান করেন। তখন বাংলার হয়ে ব্যাট করেছেন পঙ্কজ রায় ও বাদল চন্দ।

চতুর্থ দিনে একেবারেই খেলা হয়নি। পঞ্চম দিনে ১২ টার পর বাংলা দল আবার ব্যাট করতে নামেন, এবং চটপট্ রান তোলার দিকে ঝোঁক দেন। কিন্তু দিনের শেষে বাংলা দল ৪ উইকেট হারিয়ে ৩০২ রানের বেশী তুলতে পারলেন না।

বাংলার পঙ্কজ রায় ঐ ভিজে মাঠে ১৫৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন। তিনি দু'একটা চান্স দিলেও মোটের ওপর ভালই ব্যাট করেন। তারপরে বাদল চন্দের ৫৯ রান—এটাও উল্লেখযোগ্য।

শেষ পর্য্যন্ত অধিকারী পঙ্কজ রায়কে আবার টসে হারিয়ে দিয়ে রণজি ট্রফি ফাইনালে প্রথম খেলবার সুযোগ ক'রে নিলেন।

কলকাতায় হকি-মরশুম—কলকাতায় হকি খেলা সুরু হয়ে গেছে। দু'বছর ধ'রে বাংলার বাইরের বিশেষ কোন নাম করা খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যাচ্ছে না। ভারতীয় হকি ফেডারেশন কতকগুলি আইনের জোরে এটা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এতে স্থানীয় খেলোয়াড়রা খেলবার সুযোগ পেলে হয়তো আমাদের হকির মান কিছু উন্নত হবে। এটা আমাদের খুবই আনন্দের কথা। এত কড়াকড়ি সত্বেও দু'চারজন বাইরের খেলোয়াড়কে এবারে কলকাতার মাঠে খেলতে দেখা যাবে।

গত দু'বছরের লীগ-চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের কোন নিয়মিত খেলোয়াড়কে এবারে বাইরে যেতে দেখা যায়নি। গত-বছরে যে-সব খেলোয়াড় খেলেছিলেন তাঁরা সকলেই আছেন। উপরন্তু উত্তর প্রদেশ থেকে হেমপ্রকাশ, ভবানীপুর থেকে হরেদও সিং ও ইষ্টবেঙ্গলের দীনদয়াল আসাতে খুবই শক্তিশালী হয়েছে দলটি।

গত বছরের রানার্স-আপ ভবানীপুরের দু'চারজন নিয়মিত খেলোয়াড়কে এ-বছরে খেলতে দেখা

যাবে না। রবি দাশ ও বালু ইষ্টবেঙ্গলে যোগদান করেছেন। তবে দু'চারজন পুরনো ও নতুন খেলোয়াড় নিয়ে ভবানীপুর দলটিকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেছে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবও অনেক নতুন খেলোয়াড় আনিয়ে দলটিকে পুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। পাঞ্জাব থেকে ডোগরা, পুনা থেকে গুরুবক্স, মহীশূর থেকে উন্নিকৃষ্ণণ ও পাঞ্জাব স্পোর্টস থেকে শেঠি ও জগদীশ যোগদান করেছেন। এবারে আশা করা যায় যে, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব হকিতে উন্নততর খেলা দেখাতে সক্ষম হবে।

কাষ্টমসের কোন খেলোয়াড় অদলবদল হয়নি। ক্লডিয়াস, টডম্যান, রবি দেও প্রভৃতি খেলোয়াড়কেই খেলতে দেখা যাবে। মহমেডান স্পোর্টিং পাকিস্তান থেকে দু'একটি খেলোয়াড় আনাবার চেষ্টায় আছে।

মোট ১৯টি দল প্রথম ডিভিসন লীগে প্রতিযোগিতা করে। গতবার দুটি ক্লাব ডালহৌসি ও অরোরা দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গেছে। তার বদলে রাজস্থান ও আদিবাসীকে প্রথম ডিভিসনে খেলতে দেখা যাবে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত গোড়ার দিককার কয়েকটি ক্লাবের লীগ টেবিল এখানে দেওয়া হলো।

	খেলা	জয়	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
রেঞ্জার্স	৫	৪	১		৯	২	৯
মোহনবাগান	৪	৪			১৭	২	৮
ভবানীপুর	৪	৩	১		৭		৭
মহঃ স্পোর্টিং	৩	৩			৪		৬

● জেনে রাখা ভালো

রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। গির্জ্জাটি ১৮ হাজার বর্গগজ পরিমিত জায়গার ওপর অবস্থিত। এই গির্জ্জাটি তৈরী ক'রতে ১৮২ বছর সময় লেগেছিল। গির্জ্জাটির দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট। এই বৃহৎ গির্জ্জাটির ভিতরে ৫৪ হাজার লোক এক সঙ্গে বসে' উপাসনা ক'রতে পারে।

রাইট্ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের জীবন-চিত্র

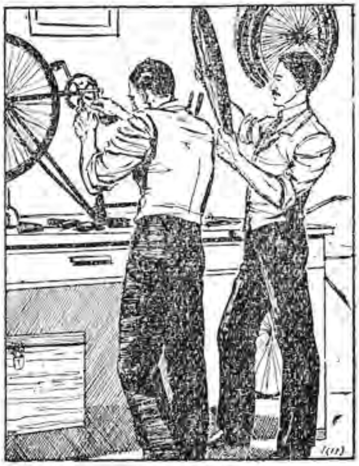

১। দুই ভাই, উইলবার রাইট্ ও অরভাইল রাইট্ একদিন তাঁদের চোখে পড়ল একটা খেলনা উড়ন্ত চরকি। বোঁ বোঁ ক'রে চরকিটা উড়ে শূন্যে উঠে যায়। এটা দেখে তাঁদের মনে হয়, বাতাসের চেয়ে ভারী এই চরকিটা যদি শূন্যে উড়ে যেতে পারে, তাহলে ভারী জিনিসও ত' উড়তে পারে? শুরু হয় তাঁদের গবেষণা।

২। **বাল্যকাল**—তাঁদের বাবা ছিলেন আমেরিকার ওহিও প্রদেশের মন্ত্রী। ধনীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও কঠিন শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের মধ্যে তাঁদের বড় হ'তে হয়েছে। ফলে চিন্তা করবার সামর্থ্য ও নির্ভীকতা তাঁদের চরিত্রের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল।

৩। **বাইসিকেলের কারখানা**—শিক্ষার জন্যে কলেজে ভর্ত্তি না হয়ে রাইট্ ভাইদের বাইসিকেলের দোকান খোলেন। উদ্দেশ্য—নানা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ও আবিষ্কার করা।

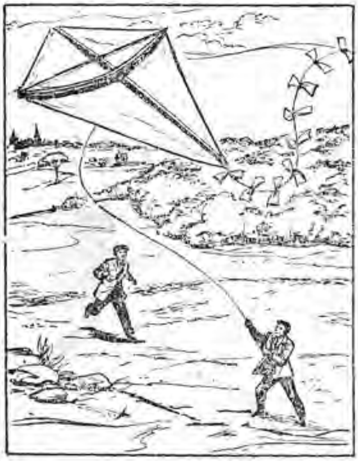

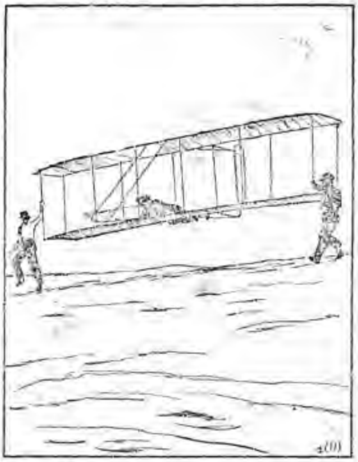

১। **ঘুড়ি উড়ান**—খেলার ছলে ঘুড়ি উড়াতে উড়াতে রাইট্ ভাই দু'জন গ্লাইডার উড়ানোর মূলসূত্র বুঝতে পারেন। এদিকে তাঁরা এক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুর খবর পান। শূন্যে গ্লাইডারে ক'রে ভেসে বেড়ানোর পরীক্ষা করবার সময় তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই ব্যাপারে তাঁরা উড়ন-যন্ত্র সম্বন্ধে আরও কৌতূহলী হ'য়ে উঠেন।

২। **পরীক্ষা**—রাইট্ ভাইরা পরীক্ষার পর পরীক্ষা ক'রে চলেন—কিন্তু সাফল্য বুঝি আসে না! না, শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের অদম্য অধ্যবসায় সাফল্যমণ্ডিত হ'ল।

৩। **গ্লাইডার**—আমেরিকার এক বিস্তীর্ণ নির্জ্জন বালুকাভূমিতে রাইট্ ভাইরা তিনটি গ্লাইডার বার বার উড়াতে থাকেন। বহু বার পরীক্ষার পর তাঁরা বুঝতে পারেন, এইবার এতে ইঞ্জিন লাগান চলে।

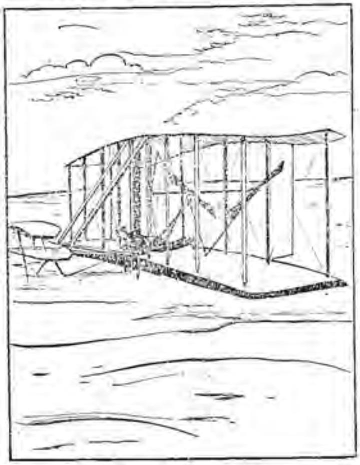

১। **বাতাসের চাপ**—তখন সুরু হ'ল ইঞ্জিন তৈরির প্রচেষ্টা। বাতাসের চাপ পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁরা একটা নল তৈরি ক'রে তার মুখে পাখা বসিয়ে দেন।

২। **সর্ব্বপ্রথম**—১৯০৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রাইট্ ভাইরা বাতাসের চেয়ে ভারী তাঁদের উড়ন-যন্ত্র তৈরি করেন। ঐ যন্ত্রের ওজন ছিল ৭৫০ পাউণ্ড, পাখার বিস্তৃতি মাত্র ৪০ ফুট আর ইঞ্জিন ছিল ১৩ অশ্বশক্তির।

৩। **পৌরাণিক কল্পনা**—মানুষ যেদিন সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে শিখেছিল, সেদিন থেকেই সুরু হয়েছিল মানুষের জয়যাত্রা। মানুষ ঘোড়ার পিঠে লাগাম দিলে। জলে সাঁতার দিতে শিখলে। পাখীর উড়াকেও সে হিংসা করল। তাই সূর্য্যদেবতা (অ্যাপোলো) রথে চড়ে আকাশ দিয়ে যান, এ কল্পনাও সে করেছিল।

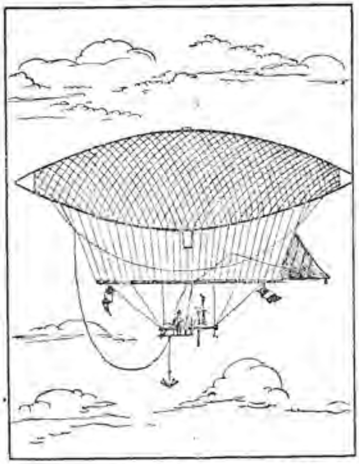

১। **লিওনার্দো দ' ভিন্সি**—১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দ' ভিন্সি। বাদুড়ের উড়ার অনুকরণে উড়ার পদ্ধতির নক্সা আঁকেন। প্যারাশূটের কল্পনা তাঁর মাথায় প্রথম উদয় হয়।

২। **বেলুন**—মানুষের উড়বার নেশা বহুকালের। কেউ প্রকাণ্ড বড় ঘুড়ির লেজ ধরে খানিকক্ষণ শূন্যে উড়েছেন। কেউ বা গরম বাতাসপোরা বেলুনে উড়েছেন। তাঁদের সকলকেই বাতাসের গতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। একমাত্র রাইট্ ভাইদের উড়োজাহাজ প্রথমে বাতাসের গতির বিপরীতে উড়ে।

৩। **প্রথম চেষ্টা**—খারাপ আবহাওয়া ও ইঞ্জিনের গোলমালে রাইট্ ভাইদের প্রথম প্রচেষ্টা বাধা পায়। দ্বিতীয় চেষ্টায় উড়োজাহাজ মাত্র সাড়ে তিন সেকেণ্ড ধ'রে উড়েছিল। এতেও তাঁরা হতাশ না হয়ে আবার কাজে লেগে যান।

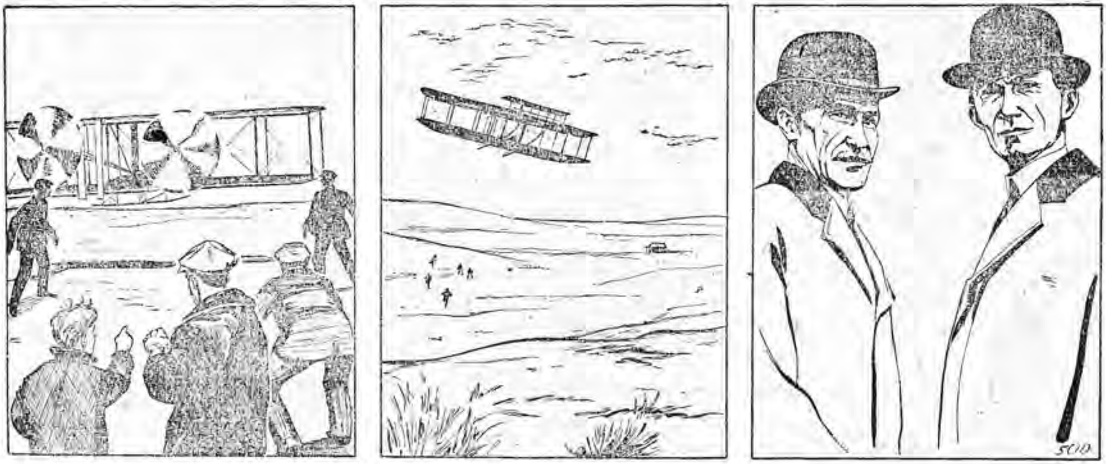

১। উড়োজাহাজ—১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৩। কিটি হক্ অঞ্চলের মরু প্রান্তর। একটি বালক ও পাঁচজন লোক ইঞ্জিনচালিত উড়োজাহাজ উড়তে সর্ব্বপ্রথম দেখতে পায়। আনন্দ ও বিস্ময়ে তারা অবাক হয়ে উড়োজাহাজটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বহুদিনের অবিশ্বাস এক মুহূর্ত্তে দূর হয়।

২। পুনঃ পুনঃ উড়া—উড়ার পরীক্ষার বহর শুনলে আজ হাসি পায়। কিন্তু তখন ছিল মহা সমস্যা। উড়োজাহাজ চালালেন অরভিল নিজে প্রথমবারে, ১২ সেকেণ্ডে ১২০ ফুট গিয়ে যন্ত্রটি নেমে পড়ে। দ্বিতীয়বারে যায় ১১ সেকেণ্ডে ১৯৫ ফুট, তৃতীয় বারে ১৫ সেকেণ্ডে ২০০ ফুট, আর শেষবারে ৫৯ সেকেণ্ডে ৮৫২ ফুট। শেষবারে বাতাসের ঝাপটায় উড়োজাহাজটির ক্ষতি হয়।

৩। সাফল্য—এ জগতের লোকগুলি প্রথমে উড়োজাহাজের কথা বিশ্বাসই করতে চায়নি। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকে না। অবিশ্বাস নষ্ট হ'তে তারা একসঙ্গে রাইট্ ভাইদের অভিনন্দন জানায়।

জেনে রাখা ভালো

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরোণো ঘড়ি আছে Dijon-এর নোতেরদাম গির্জ্জায়। এই ঘড়িটি তৈরী করেন Jaques Mark. ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে Philip the Hardy এ'টি নগরবাসীদের উপহার দেন। ঘড়িটির বয়স সাড়ে পাঁচশ' বছরেরও বেশি। কিন্তু এখনো ঘড়িটি ঠিক্ চ'ল্‌ছে।

নূতন ধাঁধা

১। চার অক্ষরে নাম বল, না যায় খণ্ডন,
সারা দেহ ই-কারান্ত, বর্ণ—ব্যঞ্জন। বন্দনা ও রুনু মজুমদার—বরিশাল

২। সত্যযুগের এমন একজন বীরের নাম কর, যিনি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই আছেন।
শ্রীপরমানন্দ ব্যানার্জ্জী—গ্রাঃ নং—১৫০৮৩

৩। এমন তিনটে শব্দের নাম কর, যাদের প্রথম অক্ষরগুলো পরপর সাজালে প্রথম শব্দটা তৈরী হয়, দ্বিতীয় অক্ষরগুলো পর পর সাজালে দ্বিতীয় শব্দটা তৈরী হয়, আর তৃতীয় অক্ষরগুলো পর পর সাজালে তৃতীয় শব্দটা তৈরী হয়; কিন্তু প্রথম এবং তৃতীয় শব্দটির অর্থ এক হওয়া চাই। এখন বলতো শব্দগুলো কি কি? শ্রীকল্যাণ সেনগুপ্ত—আলিপুর দুয়ার জংশন

ছবির ধাঁধা

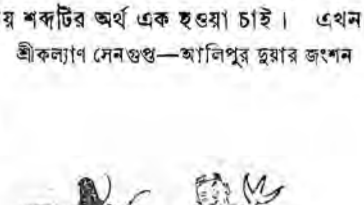

এবার থেকে—তোমাদের সামনে এনে ধরবো রকমারী ছবির ধাঁধা। কিন্তু, তার আগে এক গল্প শোনো মজার ধাঁধার। অর্থাৎ, যার খেয়ালে সৃষ্টি হয়েছিলো নাওয়া খাওয়া ভুলিয়ে দেবার খেলা—সে ছিল চীনদেশের 'বিখ্যাত ট্যান'। আর তারই নামানুসারে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়ে এ খেলাটির নাম হয়েছে 'ট্যান্‌গ্রামস্'।

সেই ট্যান, চীন সম্রাটকে তাক লাগিয়ে দেবে ভেবে, একদিন কুর্নিশ করতে করতে সম্রাটের কাছে এগিয়ে গেলো। তারপর সে উপুড় হয়ে একখানা চৌকো মতন পিচবোর্ড মাটিতে রেখে বললো—"মহারাজ, একটুখানি লক্ষ্য ক'রে দেখুন—এর এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্য্যন্ত আমি একটি রেখা টানলুম। আর এই থেকেই এমন হাসির ছবির সৃষ্টি হবে, যা দেখে আপনি খুব আমোদ পাবেন।"

সম্রাট মৃদু হাসলেন। পরে আগ্রহ নিয়ে ট্যানের কাণ্ডকারখানা তিনি দেখতে লাগলেন। ট্যান তখন করলে কি, আরও কয়েকটি এদিক সেদিক রেখা টেনে—সাত ভাগে তা কেটে নিলো।

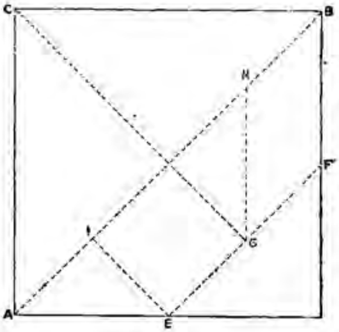

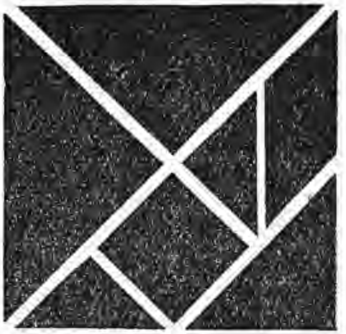

যেমন, A থেকে B, C থেকে D, তারপর বাকী অংশের মাঝামাঝি E থেকে F, পরে আবার এই রেখাটার মাঝের G থেকে D এবং G থেকে H ও শেষে E থেকে I.

এবার, এই টুক্‌রো-গুলোর একটার সাথে আর একটা জুড়ে—এখন চমৎকার এক হাসির ছবি বানিয়ে দিলে যে, দেখে মনে হয়—ট্যান যেন তার খেলা দেখিয়ে, সম্রাটের কাছে পুরস্কার নেবার জন্যে আনন্দে হাত পেতেছে।

হো হো ক'রে হেসে সম্রাট বললেন—"আচ্ছা! সাজাও দেখি আর একটি ছবি, যার ভাবটি হবে—ট্যান যেন তার পুরস্কার নিয়ে খুশী চিত্তে ফিরছে বাড়ী।"

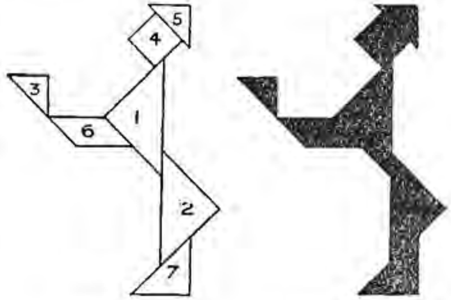

সে ছবিও ট্যান দেখালো। সম্রাট তখন নিজের হীরের আঙটি ট্যানের হাতে পরিয়ে দিয়ে—সেই যে তিনি ছবি সাজাতে বসে গেলেন, তারপর নাওয়া খাওয়াই ভুলে গেলেন। শুধু কি তাই! কত হাজার বছর আগে যে মজার ধাঁধাটি চীন সম্রাটকে মোহিত করেছিলো, আজ তা নিয়ে চীনের ছেলে বুড়ো অনেকেই অবসর সময়ে আনন্দের হাট বসায়।

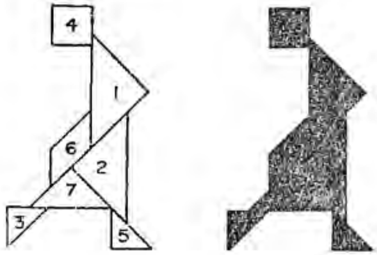

এমন কি! সম্রাট নেপোলিয়ান যখন সেন্ট হেলেনার বন্দী, তখন তিনিও তাঁর মানসিক অশান্তির হাত থেকে ভুলে থাকতে অনেক সময় এই 'ট্যানগ্রাম' নিয়ে ব'সে যেতেন। এখন, তোমরা এই থেকে মাথা খেলিয়ে আর কি ছবি বানাতে পারো—তা কালো কাগজে কেটে, খামের চিঠিতে এঁটে পাঠাও দেখি, কেমন?

—শ্রীসমর দে

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। আন্দামান
২। মোজার জন্য=For মোজা, ফরমোজা
৩। নাগুইব, নাসের
৪। চিলকা—চিল

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

মেজদা, মনীদা, গুলুদা, বিশুদা, খগেনদা, কমলদা, সমরদা, অজয় প্রভৃতি—১৩৯২৬; কাজল ও সজল দেব—নাগপুর; প্রদীপ, ছবি, প্রশান্ত, বেবী, করবী ও কাবেরী বসু—খোলাপোতা, ২৪-পরগণা; গীতা, খোকা ও তোতন—জামালপুর, মুঙ্গের; মীনাক্ষি, মঞ্জু, মিনতি ও মাধব—তালপুকুর রোড, কলিকাতা; দেবদাস, দুর্গাদাস, তুলসীদাস ও চণ্ডীদাস—এগ্রিকো, জামশেদপুর; কুমারী মালতী ও মীনা দত্ত—১৩৯২৬ ভক্তিপদ ঘোষ, বিনয়চন্দ্র মালিক ও বিশ্বনাথ ঘোষ—১০৮২১; স্বপনকুমার চৌধুরী—আঝাপুর, বর্দ্ধমান; তমাল, পরাগ, কাবুল, সুপ্রিয় ও বাবুল—?; পার্থসারথি, অভিজিত, মা, বৌদি ও বিভূতি—রোড়াবাঁধ, সিন্ত্রি; গৌরীদি, স্থার ও সেখ আব্দুল গফ্‌ফার—১০৬৯০; রথীন, দীপেন, সোমেন, শিবাজী ও উমা দে—টিনপ্লেট, জামশেদপুর; সমীর, নিশীথ, কুমারেশ, শান্তি, তিলক, মনোজ ও কানু—টিনপ্লেট, জামশেদপুর; বাসুদেব, শুকদেব, বুদ্ধদেব, মুন্টি ও রিণি দত্ত—১১২০৪; আমি, মা, বাবা, দাদারা, ইতি, অরুণ, প্রণব, বৌদি, মেজবৌদি, কাকিমা প্রভৃতি—সালিখা, হাওড়া; প্রকাশ, প্রভাত, বীথিকা, স্মৃতিকণা, দেবযানী, কাবেরী, স্নিগ্ধা ও প্রবাল বসু—টিনপ্লেট, জামশেদপুর—৩; পম্পা, শম্পা, দেবাহুতি, চৈতালী, অনিরুদ্ধ, কাঞ্চন, শিবাজী, সব্যসাচী, কল্যাণ প্রভৃতি—দ্বারহাট্টা, হুগলী; সমীর, বাচ্চু, বিজন, নিমু, বুড়ো, দুর্গারাণী, লালু প্রভৃতি—এগ্রিকো, জামশেদপুর; পরেশ, রবীন, আলপনা, টুলু, স্বপন, লাণ্টু, শ্রীলেখা, অসীম ও সত্যেন—এগ্রিকো, জামশেদপুর; গুরুদাস, সব্যসাচী, কার্ত্তিক, সুশীল, বাসু, নাড়ু, অশোক ও বিশু—যমুনা রোড, জামশেদপুর; নন্দিতা দাশগুপ্তা—কদমা, জামশেদপুর; সমীর, নিশীথ ও মলয় মিত্র—বার্মামাইন্স্, জামশেদপুর; বাসু, দীপক, নন্তু ও ঝণ্টু—কদমা, জামশেদপুর; রবি, নানু, বিনু, ভলু, পরিমল, নন্দিতা, মায়া ও মাধবী প্রভৃতি—কাশ্মীরি গেট্, দিল্লী; উৎপল চৌধুরী—হিনু, রাঁচী; উক্তি, শুক্তি, মুক্তি, মঞ্জুশ্রী ও রত্না—জি. টাউন, জামশেদপুর; উমা আঢ্য—পুরী; ছকুদা, বুবু, সুব্রত, পম্পম্, মুনু, নানী, বিজন ও রেখা—রাঁচী; রেখা, মীনা, স্বপ্না, রত্না, বিষ্ণু, নিতাই, রেবা, বীণা, সত্যেন প্রভৃতি—গোলমুড়ী, জামশেদপুর; বিশু, প্রভা, সন্ধ্যা, আরতি, শৈল, শঙ্কর, ছায়া, সুশীল ও রবি—টীনপ্লেট, জামশেদপুর; অণিমা, পূর্ণিমা ও নীলিমা—পাটনা; মা, বীথি, যুথী, পিনাকী ও লতিকা—লক্ষ্ণৌ; দেবপ্রসাদ ও জ্যোতিপ্রসাদ পাকড়াশী—বোম্বাই; নূপুর, ধ্রুব, মানস, জয়তি ও তপতী—অনন্তপুর, রাঁচী; আলোক, গীতা, বাবা ও মেসোমশাই—বিক্রম, পাটনা; শ্যামকান্ত দে—কনট্ সার্কাস, নিউ দিল্লী; নীলাব্জ সেন ও রথীন্দ্রনাথ সরকার—কদমা, জামশেদপুর; প্রকৃতি, প্রণতি, পবিত্র ও প্রণব—যমুনা রোড, জামশেদপুর; আলোকণা, অশোককুমার ও সরযুবালা ঘোষ—সীতাবল্ডী, নাগপুর; গোপীনাথ দেওঘরিয়া—১৪১৮১; অণিমা চ্যাটার্জ্জী—বার্মামাইন্স্, জামশেদপুর; সুজাতা, অশোক, অলোক, পুলক ও শুচিতা পালিত—১২৭৫৪; গোপাল হালদার, সুনীতি উপাধ্যায় ও অমরেন্দ্র মিত্র—ঝিকরহাটি, সাঁওতাল পরগণা; অনিন্দ্যকুমার, বাবু, মা ও লালিম—চানপাটিয়া, চম্পারণ; লক্ষ্মী, বুটলু, শঙ্কর, আলো, রত্না, জাপু ও ভুতু—১৪২৪৪; বেবু, আনু, ইতি, সাধনা, রাণু ও সুকুমার দা—বোকারো, হাজারীবাগ; অভিজিত ও সুজিত দে—১০৫৯৫; চাঁদু, বুবু, রাজা, রাণা, মা ও দিদি—রামদাস ভট্টা, জামশেদপুর; জগৎপতি, মাখন, সতু, খোকা, তুষার, বৈদ্য ও পুনি—১০৩৩৫।

———

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

বন্দে মাতরম্।

সারাদেশে এখন ইলেক্শনের মাতন···রাস্তা ঘাটে, পথে পার্কে যেদিকেই যাও, সেইদিকেই পোষ্টার···প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী পোষ্টারের সাহায্যে ভোট-দাতার কাছে নিজেদের নামকে পরিচিত করছেন···সকাল থেকে মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত উঠছে জন-কোলাহল, প্রত্যেক দলের লোকেরা ছড়া বেঁধে চীৎকার করছেন, ভোট দাও, ভোট দাও! ইংরেজীতে একে বলে জেনারেল ইলেকশন্! দেশের লোক যত সচেতন হবে, ততই এই ইলেকশনের উত্তেজনা তাদের পেয়ে বসবে, কারণ এই নির্দ্ধারণের ফলাফলের ওপর দেশের শাসন-ব্যবস্থা কি রকম হবে, তা নির্ভর করে। এই নির্দ্ধারণের ফলাফলের সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিকের স্বার্থ জড়ানো।

স্বাধীন ভারতের এই মাত্র দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন। এর আগে ইংরেজ আমলে নির্ব্বাচনের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না, নির্ব্বাচন-প্রথা ইংরেজ আমলেই চালু হয় কিন্তু দেশের শাসন-ব্যবস্থা তখন এমন ছিল যে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। যেকোন আইন বিদেশী-শাসকের প্রতিনিধি তাঁর ইচ্ছায় নাকচ ক'রে দিতে পারতেন। তাই ভোট দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না।

আজকে আমরা স্বাধীন। আমাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থা বদলে গিয়েছে। জাতির প্রতিনিধিরা সকলে মিলে পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসী পদ্ধতিকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন; যে-পদ্ধতিতে ইংলণ্ড শাসিত হয়। পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসী কাকে বলে? দেশের শাসকের জন্যে যে-কোন আইন দরকার, তা তৈরী করবে দেশের পার্লামেণ্ট বা বিধান-সভা। পার্লামেণ্ট বা বিধান সভার আইনই হলো দেশের আইন। এই পার্লামেণ্ট বা বিধান-সভা গঠিত হয়, একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জাতির প্রতিনিধি নিয়ে। প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর নতুন ক'রে এই প্রতিনিধি-সভা গঠিত হবে। দেশের জন-সাধারণেরই একমাত্র অধিকার, প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবার। সেইজন্যে একে বলে ডেমোক্রেসী। আর এই নির্ব্বাচন করবার অধিকারেরই নাম হলো ভোট, অর্থাৎ এই ভোটের সাহায্যে জনসাধারণ তার দেশের বিধান-সভা-গঠনের অধিকার জাহির করে। দেশের শাসনের ভার পেয়ে কংগ্রেস দল ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীকে এই ভোটের অধিকার দিয়েছেন, একেই বলে adult franchise. এই অধিকারের ভেতর দিয়ে দেশের প্রত্যেক লোকের সঙ্গে দেশের শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, এখনো পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই এই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়। ভোটের সংখ্যা-গণনা থেকে জানা যায়, সাধারণতঃ গড়পড়তা মাত্র শতকরা ৩০ কি ৪০ জন সচেতনভাবে ভোটের অধিকারকে কাজে লাগান, বাকি শতকরা ৬০ জন এখনো চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকেন, ভোটের অধিকারকে প্রয়োগই করেন নি। এখনো যাঁরা ভোট দিতে আসেন, তাঁদের অনেকে খুব স্বেচ্ছায় আসেন না, একরকম তাদের ব'লে-ক'য়ে আনাতে হয়, অনেকে খবরই রাখেন না ভোটের তালিকায় তাঁর নাম ঠিক আছে কি না, ঠিক না থাকলে যা করা দরকার তা-ও তাঁরা করেন না। এই উদাসীনতা জাতীয় দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। এ থেকে প্রমাণিত হয়, মুখে আমরা যাই বলি না কেন, নিজেদের দেশ সম্বন্ধে, দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। আমাদের এই উদাসীনতার ফলে যে বিরাট ক্ষতি হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ ফল আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই না ব'লে মনে করি, ভোট দেওয়া বা না দেওয়াতে কিছু আসে যায় না। এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছু নেই। ধর, অধিকসংখ্যক ভোট পেয়ে যে-দল দেশের শাসন-ব্যবস্থার ভার পেলেন, বাকি শতকরা ৬০ জন লোক যদি ভোট দিতেন, তাহলে হয়ত নির্ব্বাচনের ফল উল্‌টো হয়ে যেতো, অন্য আর একদল হয়ত জয়ী হতো। তখন দেশের শাসন-ব্যবস্থাও অন্যরকম হয়ে যেতো। সুতরাং পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসীতে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত, নিজে থেকে সচেতন হয়ে ভোট দেওয়া। আমরা যতই এই বিষয়ে সচেতন হবো, ততই দেখবো আমরা আমাদের দেশকে নিজেদের মতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারি।

পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির মোটামুটি কথাটা তোমাদের জানা দরকার। নির্ব্বাচনে যে-দল সবচেয়ে বেশী সংখ্যক আসন অধিকার করেন, দেশের প্রেসিডেণ্ট বা গভর্ণর তাঁদেরই আহ্বান করেন মন্ত্রীত্ব গঠন করবার জন্যে। এই বিজয়ী দল ছাড়া পার্লামেণ্টে আর একটী দল থাকে, শাসন-ব্যবস্থায় তাঁদেরও সমান দরকার। তাঁদের বলে opposition. এঁরা মন্ত্রীত্ব গঠন করবার মতন বেশীসংখ্যক আসন অধিকার করতে পারেন নি কিন্তু তাঁরাও বিধান-সভার সভ্য। বিধান-সভার কাজ যিনি পরিচালনা করেন, তাঁকে বলে Speaker, তিনি কোন দলের লোক নন্, তাঁর কাজ হলো দল-নির্ব্বিশেষে বিধান-সভার পদ্ধতি ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তাই দেখা। এই Speaker-এর ডান দিকে বসেন মন্ত্রীর দলের লোকেরা, আর তাঁর বাঁ দিকে অর্থাৎ left-এ বসেন opposition বা বিরোধী দলের লোকেরা। সেই থেকে Leftist কথাটার মানেই হয়ে গিয়েছে বিরোধী দল। মন্ত্রী না থাকলে যেমন শাসন-ব্যবস্থা চলে না, তেমনি opposition না থাকলে গণতন্ত্র ঠিক মত কাজ করে না। Opposition-এ যাঁরা যান, তাঁদের কাজ হলো মন্ত্রীত্বের ভুল-চক অথবা দলীয় [illegible]

করা। তাই opposition না থাকলে, parliamentary democracy প্রহসন হয়ে যায়, যে-দলের সংখ্যা বেশী সে-দল যা খুশী তাই করতে পারে। সেইজন্যে opposition যদি strong হয়, বিরোধী দলেও যদি সত্যিকারের যোগ্য লোক থাকেন, গণতন্ত্রের কাজ ঠিক মত চলে। ভোট দেবার সময় এই সব কথা ভেবেই ভোট দিতে হয়। কোন্ দলে কে ভোট দেবে, সেকথা এখানে আলোচনা করবার জায়গা নয়, তবে একটা কথা তোমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ভোট দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রত্যেক নাগরিকেরই সচেতন হওয়া উচিত। এতদিন সংগ্রাম ক'রে তুমি আমি বাস্তবভাবে যে-জিনিস পেয়েছি সে হলো এই ভোট দেবার অধিকার। এই অধিকারকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে শেখো, এই হলো স্বাধীন দেশের নাগরিক-চেতনার আসল ভিত্তি। এই সম্বন্ধে যত বেশী সচেতন হবে, ততই দেখবে, তোমার দেশের নেতাদের ওপরও তোমার যথেষ্ট প্রভাব আছে, তোমার দেশের নেতারাও অখ্যাত অজ্ঞাত তোমাকে অবজ্ঞা করতে পারবেন না। জয় হিন্দ। ইতি —দাদুমণি।

পুত্রহারা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভাণ্ডারহাটিতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক সভায় বক্তৃতা করতে যান। বক্তৃতার পর তিনি যখন স্থানীয় কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে যান, সেই সময় একটি স্ত্রীলোক তাঁর কাছে আসেন। বারবার তাঁকে বলতে থাকেন, "আমার ছেলেরা কোথায় ? আমাকে তোমাদের সঙ্গে নাও।"

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এতে অত্যন্ত বিস্মিত হন, এবং ব্যাপারটির অনুসন্ধান করেন। জানা যায় যে, ভদ্রমহিলার শঙ্কর নামে একটি ছেলে ছিল। আজীবন কংগ্রেসের সেবা ক'রে শঙ্কর কিছুদিন হ'ল মারা গেছে। সন্তানহারা জননী দেশের সকল কংগ্রেস কর্ম্মীকে ফিরে পেতে চান তাঁর পুত্ররূপে। তিনি তাই অমন প্রশ্ন করে-ছিলেন। সকল কংগ্রেস কর্ম্মীদের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে তিনি চান তাদেরই কাজ করতে। এক পুত্রকে হারিয়ে শত পুত্রকে ফিরে পাওয়ার এক অভিনব দৃষ্টান্ত!

শিক্ষার আগ্রহ

স্বাধীনতা লাভের পর লোকের মনে শিক্ষা-লাভের যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, এটা দেশের পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ বলেই আমরা মনে করি। এবারে আগামী ৪ঠা এপ্রিল যে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা সুরু হবে, তাতে প্রায় পঁচাত্তর হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করছে। এই সংখ্যা গত বছরের তুলনায়—প্রায় চার হাজার অধিক। দিনে

দুর্ঘটনা এড়াতে গিয়ে জীবন দান

গত ১লা জানুয়ারী উত্তর রেলের টুণ্ডলা-গাজিয়াবাদ শাখার হাতরাসের নিকট পোরা রেল ষ্টেশনে একটা বড় রকমের রেল-দুর্ঘটনা এড়াতে কৃতিত্ব দেখাবার জন্য শ্রী এস আই এ জৈদি নামক জনৈক রেল-গার্ডকে উক্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।

কুকুরের আকাশ ভ্রমণ

মানুষ চায়, পাখীর মত ডানা মেলে আকাশে বেড়াতে। তাই সৃষ্টি হ'ল এরোপ্লেনের। এরোপ্লেনও আবার একটা নির্দ্দিষ্ট উচ্চতার পর আর উড়তে পারে না। কারণ যতই ওপরে ওঠা যায়, ততই বাতাসের চাপ কমে যায়। ফলে সৃষ্টি হ'ল রকেট —যা মানুষকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এক ধরণের রকেট তৈরী করেছেন, যা মাটি থেকে সত্তর মাইল উঁচুতে যেতে পারে।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঐ রকেট প্রথম ছাড়া হয়। এই রকেটের নীচের দিকে একটি ঘর ক'রে তাতে কয়েকটি কুকুরকে তুলে দেওয়া হয়। প্রায় তিনঘণ্টা পর রকেটটি আকাশ থেকে নেমে আসে। স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় দেখা যায়, অক্সিজেনপূর্ণ ঐ ঘরের মধ্যে থাকার সময় কুকুরগুলির স্বাভাবিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। এইভাবে সত্তর মাইল ওপরে ওঠার গৌরব কুকুরগুলিই প্রথম লাভ করে। বেলুন যখন প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তখন বেলুনে প্রথম চড়ানো হয় কয়েকটি হাঁস ও মুরগীকে।

শ্রীনেহেরুকে উপহার

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীজওহরলাল নেহেরু যখন পাটনা বিমানঘাঁটিতে এসে পৌঁছান, তখন জনতার মধ্য থেকে একটি সাত বছরের বালক শ্রীনেহেরুর নিকট এগিয়ে যায়, এবং তার খেলার মোটর গাড়ীটি তাঁর সামনে এগিয়ে ধ'রে বলে, "এটি তুমি নাও।"

হাসতে হাসতে শ্রীনেহেরু বলেন, "আমি তো চড়তে পারবো না—তার চেয়ে বরং ওটা তুমি নিয়েই খেলা করো।"

ছেলেটি ভাবতে থাকে, হয়ত গাড়ীটি নেহেরুর পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু এর চেয়ে ভাল খেলনা তো তার কাছে আর নেই! তাই সে নেহেরুকে আবার অনুরোধ করে গাড়ীটি গ্রহণ করবার জন্য।

অতঃপর শ্রীনেহেরু উপহার গ্রহণ করেন, এবং পরিবর্ত্তে বালকটিকে একছড়া কিংখাবের মালা উপহার দেন।

টেলি : বিত্তাসেবা পোঃ বক্স : ১১৪৫০

জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও উন্নতির মুলভিত্তি

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস্ লিঃ

হেড অফিস :—৩২এ, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা—১

ফোন :—২২-১৫৩২, ২২-১৫৩৩, ২২-১৫৩৪ (তিন লাইন)

সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী কাগজ, বোর্ড, ছাপা কালি ইত্যাদি
ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করেন

ব্রাঞ্চ :—১৬৭ নং, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৪।৩৫, „ „ „
৬৪ নং, হারিসন রোড, কলিকাতা ফোন নং : বড়বাজার, ৩৪-১০২০
মফস্বল ব্রাঞ্চ :—এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচি ও কটক